ইসলামে রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার মূলনীতি

মুহম্মদ আসাদ

অনুবাদ

শাহেদ আলী

ইসলামে রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার মূলনীতি

মুহম্মদ আসাদ

শাহেদ আলী
অনূদিত

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

ইসলামে রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার মূলনীতি
মুহম্মদ আসাদ
শাহেদ আলী অনূদিত

ইফাবা প্রকাশনা ঃ ৪০২/৩
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ৩২১.৮০২৯৭
ISBN : 984-06-0246-2

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬৬

চতুর্থ প্রকাশ
জুলাই ১৯৯৪
আষাঢ় ১৪০১
মহররম ১৪১৫

প্রকাশক
এম. আতাউর রহমান
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০

মুদ্রণ ও বাঁধাই
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রেস
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ
মোস্তফা কামাল ভূঁইয়া

মূল্য ঃ ৩৮.০০ টাকা

ISLAME RASTRA O SARKER PARICHALONAR MULNITI : Bengali version by Shahed Ali of 'The Principles of State and Government in Islam' written by Muhammad Asad and published by Islamic Foundation Bangladesh, Baitul Mukarram, Dhaka-1000.
Price: Tk 38.00; US Dollar : 1.00 July 1994

www.pathagar.com

মহাপরিচালকের কথা

ইসলাম নিছক একটি আচারসর্বস্ব জীবন-বিমুখ এবং ভাববিলাসী ধর্ম নয়, এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। আর 'জীবন' বলতে শুধু ইহজাগতিক, সীমিত সময়ের জন্য যাপিত সময়কালকে বোঝায় না; একজন মু'মিনের নিকট জীবনের পরিধি অনেক ব্যাপক, আখিরাতের সেই অসীম-অনন্ত সময়-বিস্তার পর্যন্ত তা প্রসারিত। ইসলাম এই ব্যাপক জীবন-পরিসরে মানুষের পূর্ণাঙ্গ কামিয়াবীর দিক-নির্দেশনা দেয়। রূহানী ও বৈষয়িক – এ উভয় বিষয়ই জীবনের প্রকৃত বাস্তবতা; এতদুভয়ের সুষম সমন্বয়ই জীবনকে সত্যিকার অর্থে মহিমান্বিত করে, অর্থবহ করে। ইসলাম এই পূর্ণাঙ্গ জীবনেরই সফলতার ইঙ্গিতবাহী। এ কারণেই ইসলাম যেমন রূহানী চেতনা ও দিকনির্দেশনায় পারঙ্গম, তেমনি মানব-জীবনের অপরিহার্য বাস্তবতাও সেখানে সমান গুরুত্ব নিয়ে উপস্থিত হয়েছে।

বিখ্যাত ইসলামী পণ্ডিত মুহম্মদ আসাদ লিখিত 'ইসলামে রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার মূলনীতি' গ্রন্থটি ইসলামের শেষোক্ত দিকের ওপর আলোকসম্পাতকারী একটি মূল্যবান বই। আমরা আশা করব, এই গ্রন্থটি ইসলাম সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোষণকারী এবং ইসলামের অন্তর্নিহিত মর্মবাণী ও পূর্ণাঙ্গ রূপ সম্পর্কে যারা অজ্ঞ, তাদের উপকারে আসবে। আল্লাহ্ আমাদের সকলকে এই গ্রন্থের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার মূলনীতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভের তওফিক দিন। আমীন।

দাউদ-উজ্-জামান চৌধুরী
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

ইসলামকে পাশ্চাত্যের সংকীর্ণ অর্থে 'ধর্ম' হিসাবে বিচেনার একটা প্রবণতা অনেকের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। ইসলাম যে পাশ্চাত্য অর্থের 'ধর্ম' নয়, বরং একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান, এ সত্যটি স্বীকার করে নিলে এর রাষ্ট্রনীতি বা অর্থনীতির কথাও অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে। অথচ দুঃখের বিষয় এ বিষয়ে সুলিখিত গ্রন্থ খুব বেশি নেই। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা মুহম্মদ আসাদ প্রায় চার দশক আগে এই অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়ে যে মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন, তার বাংলা অনুবাদ করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক অধ্যাপক শাহেদ আলী।

পঞ্চাশের দশকে উপমহাদেশে একটি ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের উদ্যোগকে সাহায্য করবার প্রয়োজনে এ গ্রন্থখানি প্রথম রচিত হয়। ইতিহাসের পরিক্রমায় আজ বাংলাদেশ একটি স্বতন্ত্র, স্বাধীন, মুসলিম রাষ্ট্র হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। তবে গ্রন্থখানিতে উপমহাদেশে কোন আঞ্চলিক বিষয় আলোচিত না হয়ে আধুনিক যুগে ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের সাধারণ উপায়াদি সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে বিধায় এবং ইসলামের রাষ্ট্রীয় আদর্শের রূপায়ণ আজ বাংলাদেশসহ সারা মুসলিম বিশ্বের জনগণের লক্ষ্য বলে এ গ্রন্থ থেকে বিশ্বের সকল মুসলমানই সমভাবে উপকৃত হতে পারে। এই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থখানির চতুর্থ সংস্করণ বাংলাভাষী পাঠক সমাজের সামনে তুলে ধরতে পেরে আমরা আল্লাহ্‌র দরবারে আমাদের আন্তরিক শোকরিয়া আদায় করছি।

এম. আতাউর রহমান
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ

www.pathagar.com

ভূমিকা

১৯৪৮ ইংরেজীর মার্চ মাসে পাঞ্জাব গভর্নমেন্ট কর্তৃক ইংরেজী ও উর্দু ভাষায় প্রকাশিত 'ইসলামিক কনস্টিটিউশন মেকিং' (ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন) নামক আমার প্রবন্ধে আমি প্রথম যেসব ভাবধারা লিপিবদ্ধ করেছিলাম, বর্তমান পুস্তকটি সেসবেরই পূর্ণতর রূপ।

সে সময়ে আমি উক্ত সরকারের ইসলামী পুনর্গঠন বিভাগের পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত ছিলাম। এ প্রতিষ্ঠানটি একটি সরকারী সংস্থা এবং আমাদের নতুন সমাজ ও নতুন রাষ্ট্র বুদ্ধিবৃত্তিক এবং সমাজ ও আইন সম্পর্কিত যেসব মূলনীতির ভিত্তিতে গঠিত হওয়া উচিত সেগুলোর অনুসন্ধান-আবিষ্কারে এটা নিয়োজিত। বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে খুব স্বাভাবিকভাবেই পাকিস্তানের ভবিষ্যত শাসন-সংবিধান সম্পর্কিত প্রশ্নটিই আমাকে সবচেয়ে গভীরভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। সেই সংবিধানের রূপ কি হওয়া উচিত তা এখন যেমন, তখনো তেমনি সকলের নিকট মোটেই স্পষ্ট ছিল না। সত্যিকার একটি ইসলামী রাষ্ট্রের কল্পনায় — এমন একটি রাষ্ট্র, যার ভিত্তি (প্রচলিত সকল রাজনৈতিক শ্রেণীবিভাগ থেকে স্বতন্ত্ররূপে) জাতীয়তাবাদ বা বংশ-গোত্রের উপর নয়, বরং সম্পূর্ণরূপে আল-কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত — তারই স্বপ্নে আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক যদিও অনুপ্রাণিত তবুও তখনো পর্যন্ত সরকার পরিচালনার যেসব পদ্ধতি ও যেসব প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রকে একটা সুস্পষ্ট ইসলামী চরিত্র দান করবে এবং একই সঙ্গে বর্তমান যুগের চাহিদাও পূরণ করবে সে সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল না। জনসংখ্যার একটি অংশ সরল বিশ্বাসে ধরে নিয়েছিল যে, প্রকৃত ইসলামী রাষ্ট্ররূপে গণ্য হতে হলে পাকিস্তান সরকারেরও অবশ্যি প্রাথমিক যুগের খিলাফতের আদর্শের প্রায় হুবহু প্রতিরূপ হওয়া উচিত, যাতে রাষ্ট্রপ্রধান হবেন স্বেচ্ছাচারীর ক্ষমতায় ক্ষমতাবান, সমস্ত সামাজিক ব্যাপারে চূড়ান্ত রক্ষণশীলতার নীতি (নারী সমাজের কম-বেশি অবরোধসহ) অনুসৃত হবে এবং থাকবে একটি পিতৃকেন্দ্রিক অর্থনীতি যা বিশ শতকের জটিল আর্থিক ব্যবস্থাকে বর্জন করে যাকাত নামে পরিচিত একমাত্র করের মাধ্যমে আধুনিক জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের সকল সমস্যার সমাধান করবে। অপরাপর দল — যারা অধিকতর বাস্তববাদী এবং সম্ভবত সমাজজীবনের একটা গঠনমূলক উপাদান হিসেবে ইসলামের প্রতি কম অনুরাগী — তারা পাশ্চাত্য পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রগুলোতে সাধারণত বৈধ এবং যুক্তিগ্রাহ্য বলে যা গৃহীত তার থেকে অভিন্ন পথে পাকিস্তানের বিকাশ আশা করেছিলেন। অবশ্যি পাকিস্তানে শাসন-সংবিধানে শুধু এ আনুষ্ঠানিক উল্লেখটুকু তাঁরা মানতে রাযী ছিলেন যে, ইসলাম হচ্ছে রাষ্ট্রীয় ধর্ম এবং সম্ভবত জনসাধারণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের ভাবাতিশয্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ধর্মীয় ব্যাপারের জন্য একটি মন্ত্রীপদ প্রতিষ্ঠায়ও তাঁদের আপত্তি ছিল না।

www.pathagar.com

এই দুই চারমপন্থী দলের মধ্যে সেতু রচনা করা সহজ কাজ ছিল না। এমন একটি শাসন সংবিধানের কাঠামোর প্রয়োজন ছিল, যা ইসলাম শব্দটির পূর্ণ অর্থে পুরোপুরি ইসলামসম্মত হবে এবং আমাদের কালের বাস্তব প্রয়োজনগুলো যাতে বিবেচিত হবে; এ দাবি আমাদের এ প্রত্যয়ের দ্বারাই সমর্থিত ছিল যে, ইসলামের সামাজিক কর্মসূচীতে সকল কালের এবং মানুষের বিকাশের সকল স্তরের সমস্যার যুক্তিসিদ্ধ সমাধান মেলে। অবশ্য প্রচলিত ইসলামী সাহিত্য আমাদের এই সংকটে কোনো দিকনির্দেশ করে না। পূর্বতন কয়েক শতাব্দীর — বিশেষ করে আব্বাসীয় আমলের কতিপয় মুসলিম পন্ডিত ইসলামের রাষ্ট্রীয় বিধান সম্পর্কে কিছুসংখ্যক কিতাব আমাদের জন্য রেখে গেছেন, কিন্তু সমস্যা সমাধানে তাঁদের প্রচেষ্টা স্বভাবতই তাঁদের সময়ের সাংস্কৃতিক পরিবেশ এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজনের দ্বারা নিরূপিত ছিল এবং সে কারণে তাঁদের পরিশ্রমের ফল বিশ শতকের একটি ইসলামী রাষ্ট্রের প্রয়োজনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না। পক্ষান্তরে একই বিষয়ে আধুনিক মুসলিমদের রচিত যেসব গ্রন্থ পাওয়া গেল, সাধারণভাবে সেগুলোর ত্রুটি হচ্ছেঃ আধুনিক ইউরোপের রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা, প্রতিষ্ঠান এবং সরকার পরিচালনা পদ্ধতিসমূহ গ্রহণ করার অতি ব্যাকুলতা যার সঙ্গে (এইসব গ্রন্থকারের মতে) আধুনিক ইসলামী রাষ্ট্রের মিল থাকা উচিত। এই মনোভাবের ফলে এসব গ্রন্থকার বহু ক্ষেত্রে এমন বহু ধারণা গ্রহণ করেছিলেন, যা ইসলামী আদর্শের সত্যিকার প্রয়োজনের সম্পূর্ণ বিরোধী।

কাজেই আমাদের পূর্ববর্তীদের কিতাব কিংবা আমাদের সমকালীন গ্রন্থকারদের পুস্তক - কোনটি থেকে একটা সন্তোষজনক ধারণাগত ভিত্তি আমরা পাই না যার উপর আমাদের নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানকে গঠন করা উচিত। এমতাবস্থায় আমার জন্য শুধু একটি পথই খোলা থাকল আর সেটি হচ্ছে ইসলামী আইনের মূল উৎস আল-কুরআন ও সুন্নাহ্‌র শরণাপন্ন হওয়া এবং ইসলামী রাষ্ট্র সম্পর্কে যা কিছুই লিখিত হয়েছে সেসবকে গণনার মধ্যে না এনে আল-কুরআন ও সুন্নাহ্‌র ভিত্তিতে পাকিস্তানের ভবিষ্যত শাসন-সংবিধানের বাস্তব সূত্রগুলো খুঁজে বার করা। এই লক্ষ্যানুসারে এবং আল-কুরআন, হাদীস-বিজ্ঞান বা হাদীস এবং ফিকাহ্ শাস্ত্র সম্পর্কে আমি ইতিপূর্বে বহু বছর ধরে যে অধ্যয়ন-অনুশীলন করেছিলাম তারই সাহায্যে আমি সরাসরি আল-কুরআন ও সহীহ্ হাদীস থেকে প্রাপ্ত সুস্পষ্ট রাজনৈতিক বিধি-নির্দেশের ভিত্তিতে ইসলামী শাসন-সংবিধানের তত্ত্বগত একটা কাঠামো দাঁড় করানোর সিদ্ধান্ত করি। এই কাঠামোর ভিত্তি-নিহিত মৌলিক নীতিগুলো আল-কুরআন থেকে নিয়েছি এবং প্রাসঙ্গিক সকল খুঁটিনাটি ও সেসবের প্রয়োগ-পদ্ধতি সংসৃহীত হয়েছে সমাজ-জীবনের বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক দিকের সঙ্গে সম্পর্কিত রসূলুল্লাহ্‌র প্রায় সত্তরটি হাদীস থেকে। আমার এই প্রচেষ্টার ফল হলো। 'Islamic Constitution Making' নামক পূর্বোক্ত সুদীর্ঘ প্রবন্ধ। রাজনৈতিক ঘটনাবলীর কারণে - এখানে যার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন — আমার পরামর্শগুলোর অতি অল্প কয়েকটিই মাত্র, যদি আদৌ কোন কোনটি গৃহীত হয়ে থাকে, ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সংবিধানে (যা এখন বাতিল) কাজে লাগানো হয়েছে। সম্ভবত, ১৯৪৯ সনে গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবনাতেই শুধু এসব পরামর্শের প্রতিধ্বনি মিলতে পারে।

www.pathagar.com

সাত

অতীতের এক যুগের দুঃখজনক অভিজ্ঞতার পর, পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক ভবিষ্যতের প্রশ্ন এখন অমীমাংসিত এবং এ কারণে আমার মনে হয় ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধানের ভিত্তিগত নীতিগুলো কি হওয়া উচিত এ আলোচনার প্রয়োজন এখনো ফুরিয়ে যায় নি। পক্ষান্তরে, মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর কোনটিই যে আজো প্রকৃতপক্ষে ইসলামী পদবাচ্য কোন সরকার পরিচালনা পদ্ধতি উদ্ভাবনে সমর্থ হয়নি সে কারণেই এ আলোচনা অব্যাহত রাখা অবশ্য কর্তব্য — নিদেনপক্ষে সেই সব জনমন্ডলীর জন্য, ইসলাম যাদের জীবনের একটা প্রখর সক্রিয় সত্য। বর্তমান পুস্তকটি এ আলোচনাটিকে সজীব রাখারই একটা প্রয়াস। অপরিহার্যভাবেই আমার কোন কোন সিদ্ধান্ত বিতর্কের কারণ হবে; কিন্তু আমি সব সময়েই বিশ্বাস করেছি এবং এখন আরো গভীরভাবে বিশ্বাস করি যে, নানা মতের মধ্যে উদ্দীপনামূলক দ্বন্দ্ব–সংঘর্ষ ব্যতীত কিছুতেই মুসলিম সমাজের বুদ্ধিবৃত্তিক অগ্রগতি সাধিত হবে না – বিশ্বাস করি যে اختلاف علماء امتى رحمه 'আমার উম্মতের মধ্যকার পন্ডিতদের মতানৈক্য আল্লাহ্‌র রহমতের নিদর্শন।'

রসূল করীম (সা)–এর এই বাণীর একটি সুনিশ্চিত, সৃজনধর্মী মূল্য আছে – যা মুসলিম ইতিহাসের ধারায় বারবারই উপেক্ষিত হয়েছে এবং তার ফলে মুসলমানের সামাজিক অগ্রগতি হয়েছে বিঘ্নিত।

শেষ করার আগে করাচীর হাজী আনিসুর রহমান মেমোরিয়েল সোসাইটির প্রতি আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কারণ, সোসাইটির উদ্যোগে ও উৎসাহে এই পুস্তকটি রচিত হয়েছে এবং আমার পাকিস্তানী মুসলিম ভাইদের নিকট তা পেশ করা সম্ভব হয়েছে।

মুহম্মদ আসাদ

www.pathagar.com

সূচী

প্রথম অধ্যায় ঃ আমাদের সমস্যা

ইসলামী রাষ্ট্র কেন ১
ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র চাই না কেন ৪
ধর্ম ও নৈতিকতা ৬
ইসলামী আইনের পরিসর ১০
স্বাধীন জিজ্ঞাসার প্রয়োজন ১৫

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ পরিভাষা ও ঐতিহাসিক পূর্ব-দৃষ্টান্ত

পাশ্চাত্য পরিভাষার অপপ্রয়োগ ১৭
ইসলাম রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান ২১
রসূল (সা)-এর সাহাবাদের আদর্শ ২৩

তৃতীয় অধ্যায় ঃ ইসলামী রাষ্ট্রের লক্ষ্যসমূহ

পথ-নির্দেশক মূলনীতি ৩৩
রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের উৎস ৩৬
রাষ্ট্রপ্রধান ৩৮
পরামর্শনীতি ৪২
নির্বাচনভিত্তিক পরিষদ ৪৪
মতানৈক্য ৪৬

চতুর্থ অধ্যায় ঃ শাসন-বিভাগ ও আইন-বিভাগের সম্পর্ক

পরস্পর নির্ভরশীলতা ৫০
ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ ৫১
শাসকের ক্ষমতা ৫৬
সরকারের কাঠামো ৫৭
আইন-বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে ঐক্য বিধান ৬১
আইন-পরিষদ ও শাসন বিভাগের মধ্যে বিতর্কের ফয়সালা ৬৩

পঞ্চম অধ্যায় ঃ নাগরিক ও সরকার

আনুগত্যের আবশ্যকতা ৬৭
জিহাদের প্রশ্ন ৬৮
আনুগত্যের সীমা ৭৩
মতের স্বাধীনতা ৭৯
নাগরিকদের রক্ষণাবেক্ষণ ৮২

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা ৮৫
অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ৮৬

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ উপসংহার
আমাদের পথের বাধা ৯৪
আইনের সার-সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা ৯৯
সার-সংগ্রহ পদ্ধতি ১০২
নবদিগন্তের পথে ১০৪

www.pathagar.com

ইসলামে রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার মূলনীতি

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

আমাদের সমস্যা

ইসলামী রাষ্ট্র কেন

শীঘ্র হোক বা বিলম্বে হোক, প্রত্যেক জাতির জীবনেই এমন একেকটি মুহূর্ত আসে যখন মনে হয় সে জাতি যেন তার ভাগ্য নির্ধারণের স্বাধীনতা পেয়েছে, সে এমন একটি মুহূর্ত যখন জাতি কোন্ পথ অবলম্বন করবে এবং কোন্ লক্ষ্যাভিমুখী হবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথে আর কোন প্রতিকূল ঘটনার চাপ আছে বলে মনে হয় না এবং এক পথের স্থলে অন্য পথ বেছে নেবার ক্ষেত্রে জাতিকে বাধা দেবার মতো আর কোন শক্তিই পৃথিবীতে আছে বলে বিশ্বাস হয় না। এ ধরনের ঐতিহাসিক মুহূর্ত অত্যন্ত বিরল ও ক্ষণস্থায়ী এবং এও হতে পারে, যে জাতি এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ব্যর্থ হবে, বহু শত বছর তাকে আর সে সুযোগ দেয়া হবে না।

মুসলিম বিশ্বের জাতিপুঞ্জের জীবনে এই মুহূর্ত আজ সমুপস্থিত। শতাব্দীব্যাপী সংগ্রাম, আশা, নিরাশা ও ভ্রান্তির পর মুসলিম-অধ্যুষিত প্রায় সকল দেশই ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়েছে। স্বাধীনতা অর্জনের ফলে, আজ নিজ নিজ জাতির সুখ এবং কল্যাণের জন্য কি কি মৌলিক নীতির দ্বারা তাদের রাষ্ট্র ও সমাজ জীবন পরিচালিত হওয়া উচিত সে প্রশ্নটি প্রকট হয়ে উঠেছে। প্রশ্নটি শুধু প্রশাসনিক যোগ্যতার নয়, আদর্শেরও বটে। জাতির ব্যবহারিক জীবনের রূপ নির্ধারণক্ষেত্রে ধর্মের যে অধিকার রয়েছে আধুনিক পশ্চিমী ধ্যান-ধারণা তাকে অস্বীকার করলেও নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত জাতিগুলো পশ্চিমী ধ্যান-ধারণারই দাসত্ব করে চলবে, না শেষ পর্যন্ত যথার্থ ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার রূপ গ্রহণ করবে সে সিদ্ধান্তের দায়িত্বও মুসলমানদেরই। প্রধানত এমনকি সম্পূর্ণভাবে মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্রও ইসলামী রাষ্ট্রের সমার্থক নয়। একটা রাষ্ট্রকে তখনি ইসলামী রাষ্ট্র বলা যায়, যখন ইসলামের সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কিত বিধানগুলো জাতির জীবনে সক্রিয়ভাবে প্রয়োগ করা হয় এবং দেশের মৌলিক শাসন-সংবিধানে সেগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

www.pathagar.com

কিন্তু এখানেই প্রশ্ন উঠতে পারে, ইসলাম কি সত্যি আশা করে যে, মুসলমানেরা সর্বকালে এবং সর্বাবস্থায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়াস চালিয়ে যাবে? অথবা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কামনা কি শুধুমাত্র মুসলমনাদের ঐতিহাসিক স্মৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত? ইসলামের গঠন কি প্রকৃতই এমন যে, সে তার অনুসারীদের কাছ থেকে একটা নির্দিষ্ট রাজনৈতিক এবং সামাজিক কর্মপ্রণালী দাবি করে? অথবা অন্যান্য ধর্মের মতো ইসলামও কি সময়ের প্রয়োজনের আলোকে সমস্ত রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার জনসাধারণের নিজেদের উপরই ছেড়ে দেয়? অল্প কথায়, রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে ধর্মের সংমিশ্রণ কি ইসলামের একটি খাঁটি নীতি, অথবা নীতি নয়?

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যে সব আধুনিক মুসলিম বিশ্বাসের ক্ষেত্র এবং আচরণের ক্ষেত্রকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দু'টো জগতের বস্তু বলে ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন, তাঁদের কাছে ধর্ম ও রাজনীতির নিবিড় সম্পর্ক — যা মুসলিম ইতিহাসের একটা সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য — কিছুটা অরুচিকরই ঠেকে। অন্যদিকে এই প্রশ্নটির প্রতি পূর্ণ গুরুত্ব না দিয়ে ইসলামের একটা সঠিক উপলব্ধিও অসম্ভব। যতো ভাসাভাসাভাবেই হোক না কেন, ইসলামের শিক্ষার সঙ্গে যিনিই পরিচিত তিনি জানেন যে, ইসলাম শুধু আল্লাহ্‌র সঙ্গে মানুষের সম্পর্কই নিরূপণ করে না, এই সম্পর্কের ফলস্বরূপ গৃহীতব্য সামাজিক আচরণের একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাও দিয়ে থাকে। স্বাভাবিক জীবনের সকল দিকই আল্লাহ্‌র ইচ্ছাপ্রসূত এবং সেজন্যই সেসবের একটা নিজস্ব স্বতঃসিদ্ধ মূল্য আছে — আল-কুরআন এই মৌলিক ধারণা থেকে শুরু করে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে যে, সমগ্র সৃষ্টির পরম লক্ষ্য হচ্ছে স্রষ্টার ইচ্ছার প্রতি সৃষ্টির আনুগত্য। মানুষের ক্ষেত্রে এই আনুগত্য — যাকে বলা হয় ইসলাম-আল্লাহ্‌ কর্তৃক নির্দেশিত জীবন বিধানের সাথে মানুষের বাসনা ও আচরণের সমন্বয় সাধনের জন্য একটা সজ্ঞান ও সক্রিয় প্রয়াস বিশেষ। এ দাবির প্রাক্‌ অনুমান এই যে, অন্ততঃপক্ষে মানব জীবনের বেলায় 'ভালো' ও 'মন্দের' ধারণা এমন অর্থ বহন করে যা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বা সময় থেকে সময়ান্তরে বদলায় না, বরং সকল সময়ে এবং সকল অবস্থায় তাদের সিদ্ধতা বজায় থাকে। এটা সুস্পষ্ট যে আমাদের চিন্তার মারফত প্রাপ্ত ভাল-মন্দের কোন সংজ্ঞাই এ ধরনের শাশ্বত সিদ্ধতার অধিকারী হতে পারে না, কারণ মানুষের সকল চিন্তাই মূলত মন্ময় এবং সে কারণেই চিন্তকের সময় ও পরিবেশ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। তাই, আল্লাহ্‌র ইচ্ছার সঙ্গে মানুষের বাসনা ও আচরণের সঙ্গতিসাধনই যদি ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তা হলে 'ভাল' এবং 'মন্দের' মধ্যে কি করে পার্থক্য করতে হয় এবং ফলস্বরূপ 'অকর্তব্য' ও 'কর্তব্য' কী তা-ও তাকে অবশ্যই সুস্পষ্ট ভাষায় শেখাতে হবে। নীতিশাস্ত্রের

www.pathagar.com

সাধারণ কতকগুলো উপদেশ — যেমন, 'তোমার পড়শীকে ভালোভাসো', 'সত্যবাদী হও', 'আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস রাখো', এসব যথেষ্ট নয়, কারণ এ জাতীয় নসীহতের বহু পরস্পরবিরোধী ব্যাখ্যার অবকাশ আছে। প্রয়োজন হচ্ছে এমন একটি সংহিতার যাতে আধ্যাত্মিক, দৈহিক, ব্যক্তিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় দিকগুলোসহ মানব জীবনের সমগ্র মণ্ডলটির একটা রূপরেখা থাকবে, যতো স্থূলই তা হোক না কেন।

ইসলাম একটি ঐশী আইনের দ্বারা — যাকে বলা হয় শরীয়ত — এই প্রয়োজন সিদ্ধ করে। এই ঐশী বিধান প্রদত্ত হয়েছে আল-কুরআনের আইনসমূহে এবং মহানবী মুহম্মদ (সা) — যাকে তাঁর সুন্নাহ্‌ বা জীবন পদ্ধতিরূপে আমরা বর্ণনা করে থাকি তাঁর সেই শিক্ষাসমষ্টি দ্বারা এই ঐশী আইনের পূর্ণতা দান করেছেন (অথবা বলা যায়, এর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন এবং দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছেন)। বিশ্বাসীর দৃষ্টিভঙ্গিতে, আল-কুরআন ও সুন্নাহ্‌ আমাদের কাছে আল্লাহ্‌ তা'আলার সর্বব্যাপী সৃষ্টি পরিকল্পনার একটি বুদ্ধিগ্রাহ্য অংশ উদ্‌ঘাটিত করে। মানুষের বেলায়, মানুষ কী হবে এবং কী করবে সে সম্পর্কে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার একমাত্র বাস্তব নির্দেশ আল-কুরআন এবং সুন্নাহ্‌তেই রয়েছে।

কিন্তু আল্লাহ্‌ শুধু তাঁর ইচ্ছা সম্পর্কে আমাদেরকে ইঙ্গিতই দিয়ে থাকেন। তিনি তাঁর অভিপ্রেত পন্থায় আচরণের জন্য আমাদেরকে বাধ্য করেন না। তিনি আমাদেরকে বেছে নেবার স্বাধীনতা দিয়েছেন। আমরা ইচ্ছা করলে স্বেচ্ছায় তাঁর প্রেরিত বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারি এবং বলা যায়, এভাবে তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারি। অথবা আমরা মনে করলে তাঁর বিরুদ্ধে যেতে পারি এবং তাঁর বিধানকে অমান্য করতে পারি ও তার পরিণামের ঝুঁকি নিতে পারি। আমরা যে সিদ্ধান্তই করি না কেন, দায়িত্ব আমাদেরই। বলা বাহুল্য যে, প্রথমোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর আমাদের ইসলামী জীবনযাপনের সামর্থ্য নির্ভর করে। এতদ্‌সত্ত্বেও আমরা যদি আল্লাহ্‌র প্রতি অনুগত হওয়ারই সিদ্ধান্ত করি, তবু সব সময় তা ষোলআনা পালন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব না-ও হতে পারে; কারণ যদিও এটা অনস্বীকার্য যে, ইসলামী আইনের গূঢ়তম লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তির অর্থে মানুষের সৎ কর্মপরায়ণতা, তবু এও একইরূপ অনস্বীকার্য যে, এই বিধানের একটা প্রধান অংশ শুধুমাত্র বহু ব্যক্তির সচেতনভাবে সংঘবদ্ধ চেষ্টা তথা সামাজিক প্রয়াসের মাধ্যমেই কার্যকরী হতে পারে। এ কথার তাৎপর্য এই যে, কোন ব্যক্তির যতো সদিচ্ছাই থাক না কেন, ইসলামের চাহিদা অনুযায়ী তার ব্যক্তিগত জীবনকে গড়ে তোলা হয়তো সম্ভব নয়, যদি না এবং যতক্ষণ না তার সমাজ তার ব্যবহারিক জীবনের বিষয় কর্মকেই ইসলাম-পরিকল্পিত নক্‌শার অনুবর্তী করতে রাযী হয়। এহেন সচেতন সহযোগিতা শুধুমাত্র একটা

www.pathagar.com

ভ্রাতৃত্বরোধ থেকে উদ্ভূত হতে পরে না। ভ্রাতৃত্ববোধের ধারণাকে বাস্তব সামাজিক ক্রিয়াকলাপে অবশ্যই রূপায়িত করতে হবে — যার মানে, 'যা কল্যাণকর তারই তাগিদ এবং যা ক্ষতিকর তারই নিষেধ', কিংবা ভিন্ন ভাষায় বলতে গেলে যার অর্থ — এমনতরো সামাজিক অবস্থার সৃষ্টি ও রক্ষণ যা সম্ভাব্য সর্বাধিকসংখ্যক মানুষকে সম্প্রীতি, স্বাধীনতা ও মর্যাদার সঙ্গে জীবনযাপন করতে সাহায্য করবে। এটা সুস্পষ্ট যে, কোন এক ব্যক্তির সমাজবিরোধী আচরণ অন্যান্য ব্যক্তির পক্ষে এ আদর্শের রূপায়ণকে দুঃসাধ্য করে তুলতে পারে এবং এই ধরনের বিদ্রোহাচারীর সংখ্যা যতো বেশি হবে, অবশিষ্ট সকলের জন্য এ বিঘ্নও ততো বড়ো হবে। অন্য কথায়, ইসলামী আইন কার্যকরী করা এবং সমাজের যে কোন ব্যক্তির বিদ্রোহাত্মক আচরণ — অন্ততঃপক্ষে সামাজিক ব্যাপারে বন্ধ করার জন্য কোন জাগতিক শক্তি যতোক্ষণ না দায়িত্বশীল রয়েছে ততোক্ষণ ইসলামী ব্যাপারে সমাজের সহযোগিতার ইচ্ছা মুখ্যত একটা তাত্ত্বিক ব্যাপার থেকে যেতেই বাধ্য। এই দায়িত্ব পালন একটি সমন্বয়কারী সংস্থার মারফতেই সম্ভব যা আদেশ দান (امر) ও নিষেধ করার (نهى) ক্ষমতা রাখে — অন্য কথায় রাষ্ট্রের মাধ্যমেই তা সম্ভব। অতএব এর অনুসিদ্ধান্ত এই যে, যথার্থ অর্থে ইসলামী জীবনযাপনের জন্য ইসলামী রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রসমূহ গঠন একটা অপরিহার্য শর্ত।

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র চাইনা কেন

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ইসলামের ভিত্তিতে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উন্নতির জন্য অসংখ্য মুসলমানের অন্তরে নিবিড় বাসনা রয়েছে। কিন্তু আধুনিক বিশ্বের মানসিক আবহাওয়ায় বহু শিক্ষিত লোকের কাছে এটাও প্রায় একটা স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, রাজনৈতিক জীবনে ধর্মের হস্তক্ষেপ উচিত নয়। ধর্ম নিরপেক্ষতার নীতি আর প্রগতিকে স্বতঃই অভিন্ন মনে করা হয়, ধর্মের আলোকে ব্যবহারিক রাজনীতি এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে বিচার করার পরামর্শ মাত্রকেই সোজাসুজি প্রতিক্রিয়াশীল অথবা বড় জোর অবাস্তব আদর্শবাদ বলে উড়িয়ে দেয়া হয়। বলা বাহুল্য, এ ব্যাপারেও আমাদের সমকালীন জীবনের আরো অনেক স্তরের মতোই পাশ্চাত্য চিন্তার প্রভাব সন্দেহাতীত। পাশ্চাত্যের লোকেরা তাদের নিজস্ব কারণে ধর্ম সম্পর্কে (তাদের ধর্ম) নিরাশ হয়ে পড়েছেন এবং পৃথিবীর একটি বিশাল অংশে বর্তমানে যে নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খল বিরাজ করছে তাতে আমরা এই হতাশারই প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছি। একটা নৈতিক বিধান — যা সমস্ত উচ্চতর ধর্মেরই চূড়ান্ত লক্ষ্য তারই মাপকাঠিতে নিজেদের সিদ্ধান্ত ও কার্যকলাপকে বিচার না

www.pathagar.com

করে এইসব জাতি একমাত্র সময়ের প্রয়োজনের আলোকেই রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ পরিচালনা কর্তব্য বলে মনে করে। এবং যেহেতু সময়োপযোগিতার ধারণা স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যেক দল, জাতি এবং সমাজে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে, সেজন্য জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিকর পরস্পরবিরোধী স্বার্থের প্রকাশ ঘটেছে; কারণ, এ কথা সুস্পষ্ট যে, কোন বিশেষ দল বা জাতির কাছে একান্ত ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে যা সময়োপযোগী বলে প্রতিভাত হয়, তা যেন অন্য দল বা জাতির কাছেও সময়োপযোগী বিবেচিত হবে তেমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। এজন্যই মানুষ যদি তাদের কার্যকলাপকে আত্মনিরপেক্ষ নৈতিক বিবেচনার অধীন করতে সম্মত না হয়, তাহলে তাদের স্ব স্ব স্বার্থের মধ্যে কোন না কোন পর্যায়ে সংঘর্ষ অনিবার্য এবং এই পারস্পরিক সংঘর্ষ যত বৃদ্ধি পাবে তাদের স্বার্থের বৈষম্যও ততই বৃদ্ধি পাবে, আর মানুষের সঙ্গে ব্যবহারের ক্ষেত্রে ন্যায়ের এবং অন্যায়ের ধারণা অধিকতর পরস্পরবিরোধী হয়ে উঠবে।

সংক্ষেপে, আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে 'ভালো' এবং 'মন্দের', 'ন্যায়' এবং 'অন্যায়ের' পার্থক্য নিরূপণের জন্য স্থায়ী কোন আদর্শ বা মাপকাঠি নেই। সম্ভাব্য একমাত্র মানদণ্ড হচ্ছে 'জাতির স্বার্থ।' কিন্তু নৈতিক মূল্যের কোন আত্মনিরপেক্ষ মানদণ্ড না থাকায় বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী এমন কি একটি জাতির মধ্যে বিভিন্ন দল জাতির পরম স্বার্থ কিসে নিহিত রয়েছে, সে সম্পর্কে ব্যাপক বিক্ষিপ্ত ধারণা পোষণ করতে পারে এবং সাধারণত তা করেও থাকে। একজন পুঁজিবাদী যেমন সম্পূর্ণ আন্তরিকতার সঙ্গেই বিশ্বাস করতে পারে যে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতার স্থলে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে সভ্যতা বিলুপ্ত হবে, তেমনি একজন সমাজতন্ত্রীও অনুরূপ আন্তরিকতার সঙ্গেই এই মত পোষণ করে যে, সভ্যতার স্থায়িত্ব নির্ভর করে পুঁজিবাদের উৎপাদন ও তার স্থলে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার উপর। মানুষের প্রতি কিরূপ আচরণ করা উচিত এবং কিরূপ আচরণ অনুচিত এ সম্পর্কে উভয় দলই তাদের নিজস্ব নীতিশাস্ত্রসম্মত মত দিতে গিয়ে সম্পূর্ণভাবে তাদের অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে থাকে, যার ফল হচ্ছে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যকার বিশৃঙ্খলা।

এ সত্য আজ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে যে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, কমিউনিজম, জাতীয় সমাজতন্ত্র, সামাজিক গণতন্ত্র ইত্যাদি সমসাময়িক পাশ্চাত্য রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কোনটিই এই বিশৃঙ্খলাকে শৃঙ্খলার অনুরূপ কিছুতে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়নি। একমাত্র এই কারণে যে, অবিমিশ্র নৈতিক মূল্যের আলোকে রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাবলীকে বিচার করে দেখার আন্তরিক চেষ্টা এদের কেউই করেনি। পক্ষান্তরে, এই ব্যবস্থাগুলোর প্রত্যেকটিরই ভাল-মন্দের ধারণার ভিত্তি হচ্ছে কোন না কোন 'শ্রেণী', 'দল' অথবা 'জাতির' কল্পিত স্বার্থের উপর

www.pathagar.com

— অন্য কথায়, বৈষয়িক ব্যাপারে মানুষের পরিবর্তনশীল (এবং আসলে নিয়ত পরিবর্তনশীল) পছন্দের উপর।

আমাদের যদি মেনে নিতে হয় যে, ইহা মানবিক ব্যাপারাদির একটা স্বাভাবিক এবং সেই হেতু ঈপ্সিত অবস্থা তাহলে তাৎপর্যের দিক দিয়ে আমরা এ কথাই স্বীকার করে নেব যে, 'উচিত' এবং 'অনুচিত' কথা দুটোর নিজস্ব ও প্রকৃত কোন অস্তিত্ব নেই, এগুলো সুবিধাজনক অলীক ধারণা মাত্র — যা একান্তভাবে সময় এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থারই সৃষ্টি। এই চিন্তার যুক্তিসঙ্গত পরিণতি এই যে, মানবজীবনে কোন নৈতিক দায়িত্বের অস্তিত্ব অস্বীকার করা ছাড়া মানুষের পক্ষে গত্যন্তর থাকে না। কারণ, নৈতিক দায়িত্বকে অবিমিশ্র কিছু বলে ধারণা না করলে নৈতিক দায়িত্বের ধারণাই অর্থহীন হয়ে পড়ে। যখনি আমরা স্বীকার করে নেই যে, 'উচিত-অনুচিত' এবং 'ভাল-মন্দ' সম্পর্কে আমাদের মত মানুষের তৈরি এবং সামাজিক প্রথা ও পরিবেশজাত পরিবর্তনীয় ধারণা মাত্র, তখন আর আমাদের কাজ কর্মে এগুলোকে নির্ভরযোগ্য দিশারীরূপে আমরা হয়তো ব্যবহার করতে পারি না। তাই ঐ সব ব্যাপার-বিষয়াদির পরিকল্পনার বেলায় সমস্ত নৈতিক হেদায়েতকে ত্যাগ করতে এবং সম্পূর্ণভাবে সময়ের উপযোগিতার উপর নির্ভর করতে ক্রমে ক্রমে আমরা অভ্যস্ত হয়ে উঠি এবং এটাই আবার দলের অভ্যন্তরে বিভিন্ন দলের মধ্যে নিত্যবর্ধনশীল মতদ্বৈতের জন্ম দেয় এবং আল্লাহ্ কর্তৃক স্বেচ্ছাপ্রদত্ত মানবিক সুখের পরিমাণ ক্রমবর্ধমান হারে হ্রাস করে দেয়। আধুনিক জগতের সর্বত্র যে সুগভীর অশান্তি দৃশ্যমান সম্ভবত এটাই তার চূড়ান্ত ব্যাখ্যা। যদি না এবং যতক্ষণ না কোন জাতি বা সম্প্রদায় অন্তরচেতনা থেকে প্রকৃতভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়, সে জাতি বা সম্প্রদায়ের পক্ষেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে সত্যিকার ঐক্যবদ্ধ হওয়া সম্ভবপর নয় যদি না সে মানবিক ব্যাপার-বিষয়াদির ক্ষেত্রে 'ভালো' কি 'মন্দ' কি সে সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণে ঐকমত্য অর্জন করতে সমর্থ হয় এবং এই ধরনের ঐকমত্য সম্ভবপর নয় যদি না একটা অবিমিশ্র চিরন্তন নৈতিক বিধান থেকে উদ্ভূত একটা নৈতিক দায়িত্ব সম্পর্কে জাতি বা সমাজ একমত হয়। একথা বলা বাহুল্য যে, এই ধরনের বিধান এবং তার সঙ্গে, কোন দলের অভ্যন্তরে দলের প্রত্যেকটি সদস্যকে বাধ্য করতে পারে এমন একটি নৈতিক বিধান সম্পর্কে ঐকমত্যের ভিত্তি শুধুমাত্র ধর্ম থেকেই পাওয়া সম্ভব।

ধর্ম ও নৈতিকতা

বিভিন্ন ধর্মের বিশেষ বিশেষ মতবাদ যাই হোক, তার শিক্ষা যতো উচ্চ বা আদিমই হোক না কেন, হোক না তা একেশ্বরবাদী, বহু-ঈশ্বরবাদী অথবা

www.pathagar.com

সর্বেশ্বরবাদী–ইতিহাসের সর্বকালে, সকল পর্যায়ে এবং সকল সভ্যতায় প্রত্যেক ধর্মীয় অভিজ্ঞতার অন্তরতম সত্য হচ্ছে প্রথমে মানুষের এই অন্তঃপ্রত্যয় যে, এই পৃথিবীর সমস্ত অস্তিত্ব ও ঘটনা একটা সজ্ঞান, সৃজনশীল, সর্বব্যাপী শক্তি অথবা আরো সোজা কথায় একটা ঐশী অভিপ্রায়ের ফল। দ্বিতীয়ত, এই অনুভূতি যে সে অভিপ্রায়ের সঙ্গে মানুষের আত্মিক ঐক্য রয়েছে বা অন্তত তা থাকা উচিত, শুধুমাত্র এই উপলব্ধি এবং প্রত্যয়ের উপর ভিত্তি করেই মানুষকে 'ভালো' এবং 'মন্দের' মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। কারণ সমস্ত সৃষ্টির মূলে একটি একক পরিকল্পক অভিপ্রায় কাজ করেছে এ কথা মেনে না নিলে আমাদের কোনো লক্ষ্য এবং কাজ যে মূলতই ভালো অথবা মন্দ, নীতিসম্মত অথবা নীতিবিগর্হিত আমাদের এইরূপ ধারণার কোন মানেই হয় না। এ ধরনের একটি পরিকল্পক অভিপ্রায়ে বিশ্বাস না থাকলে নৈতিকতা সম্পর্কে আমাদের সকল ধারণাই অনিবার্যরূপে ধোঁয়াটে এবং ক্রমেই অধিকতর সুযোগ–নির্ভর হয়ে উঠবে অর্থাৎ কোন লক্ষ্য বা কর্ম সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা তার সমাজের জন্য উপযোগী (শব্দটির ব্যবহারিক অর্থে) কিনা এ প্রশ্নের দ্বারাই আমাদের নৈতিকতার ধারণা প্রভাবিত হবে। এর পরিণাম এই যে, 'উচিত' এবং 'অনুচিত' আপেক্ষিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে এবং মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রয়োজনানুসারে এই শব্দ দু'টো যথেচ্ছ ব্যাখ্যার বস্তু হয়ে উঠবে। এদিকে প্রয়োজনগুলোও আবার মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিবেশে যে নিরন্তর পরিবর্তন ঘটছে সে সবেরই অধীন।

আমাদের কালের ঝোঁক নিশ্চিতভাবে ধর্ম মাত্রেরই বিরোধী আমরা যদি তা বুঝতে পারি, তা হলে নৈতিকতার ক্ষেত্রে ধর্মীয় চিন্তা ও অনুভূতির ভূমিকা সম্পর্কে এসব মতামত একটা অসীম গুরুত্ব অর্জন করবে। সর্বত্র এবং প্রত্যহ এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী আমাদের বলে চলেছেন, ধর্ম মানুষের বর্বর অতীতের লুপ্তাবশেষ ছাড়া কিছুই নয় — তাঁদের মতে, এখন তার স্থান গ্রহণ করতে যাচ্ছে বিজ্ঞান যুগ। তাঁরা বলেন, বিজ্ঞান আজ জরাজীর্ণ সেকেলে ধর্মীয় ব্যবস্থাগুলোর স্থান গ্রহণ করতে চলেছে; অমন গৌরবজনক ও অনিবার্যভাবে যার বিকাশ ঘটছে সেই বিজ্ঞান অবশেষে মানুষকে বিশুদ্ধ বুদ্ধির নির্দেশ অনুযায়ী জীবনযাপন করতে শেখাবে এবং কালে কোন অতীন্দ্রিয় শক্তির অনুমোদন ব্যতিরেকেই মানুষকে নৈতিকতার নতুন মান উদ্ভাবনের ক্ষমতা দান করবে।

বস্তুত বিজ্ঞান সম্পর্কে এই সরল আশাবাদ মোটেই 'আধুনিক' ব্যাপার নয়। পক্ষান্তরে এটা পাশ্চাত্যের আঠারো এবং উনিশ শতকের সরল আশাবাদেরই নির্বিচার প্রতিধ্বনি মাত্র। সে সময়ে (বিশেষ করে উনিশ শতকের শেষার্ধে) বহু পশ্চিমী বিজ্ঞানী বিশ্বাস করতেন, বিশ্ব–রহস্যের ফয়সালা একেবারে আসন্ন এবং এখন থেকে আল্লাহ্‌র যোগ্য স্বাধীনতা ও যুক্তি–বিচারের দ্বারা জীবনকে বিন্যস্ত

www.pathagar.com

করার পথে আর কিছুই মানুষকে বাধা দিতে সমর্থ হবে না। এ ব্যাপারে আমাদের কালের চিন্তাবিদরা অনেক বেশি সংযত, — সংশয়বাদী, একথা না হয় নাই বলা হলো। বিংশ শতাব্দীর আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের প্রচণ্ড আঘাতের ফলস্বরূপ সমসাময়িক কালের চিন্তাবিদরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, একশ' বা পঞ্চাশ বছর আগেও জড় বিজ্ঞানের সঙ্গে যে সব আধ্যাত্মিক আশা-আকাঙ্ক্ষা সংশ্লিষ্ট ছিল, এ বিজ্ঞান সেসব পূরণ করতে অসমর্থ। করণ, তাঁরা আবিষ্কার করেছেন, আমাদের গবেষণা যতই অগ্রসর হয়, বিশ্বের রহস্যসমূহ ততোই আরো রহস্যময়, আরো জটিল হয়ে ওঠে। প্রত্যেক দিনই এটা স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে যে, বিশ্ব কী করে সৃষ্টি হয়েছে, কী করে এতে প্রাণের আবির্ভাব ঘটেছে এবং প্রাণেরই বা উপাদান কী, — বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক পন্থায় এসব প্রশ্নের জবাব দান হয়তো কখনো সম্ভব না-ও হতে পারে এবং সে কারণে, মানুষের সত্যিকার প্রকৃতি এবং লক্ষ্য কী সে প্রশ্ন হয়তো অমীমাংসিতই থেকে যাবে। শেষোক্ত প্রশ্নের জবাব আমরা যতোক্ষণ না দিতে পেরেছি, ততক্ষণ 'ভালো' এবং 'মন্দ' প্রভৃতি নৈতিক মূল্যের সংজ্ঞা নির্ণয়ের চেষ্টা পর্যন্ত আমরা করতে পারছি না, শুধু এই কারণে। মানব জীবনের প্রকৃতি ও লক্ষ্যের জ্ঞানের সঙ্গে (বাস্তব অথবা কাল্পনিক) সম্পর্কযুক্ত না হলে এইসব শব্দের কোন অর্থই হয় না।

আমাদের সবচেয়ে অগ্রসর বিজ্ঞানীরা আজ এটাই উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন। পদার্থিক গবেষণার দ্বারা পরাতাত্ত্বিক প্রশ্নের মীমাংসা সম্ভব নয় এই সত্যের সম্মুখীন হয়ে, বিজ্ঞানের পক্ষে নীতিশাস্ত্র ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে পথনির্দেশ সম্ভবপর, গত শতাব্দীর এই সরল আশাবাদ তাঁরা ত্যাগ করেছেন। এসব উন্নত বিজ্ঞানী যে বিজ্ঞান হিসেবেই বিজ্ঞানকে অবিশ্বাস করেন তা নয়, বরং তাঁরা দৃঢ় বিশ্বাস করেন, বিজ্ঞানের সাহায্যে মানব জাতি অধিকতর বিস্ময়কর জ্ঞান ও সাফল্য অর্জন করতে থাকবে, কিন্তু যুগপৎ তাঁরা এও উপলব্ধি করেন যে, মানুষের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনের প্রসঙ্গে বৈজ্ঞানিক প্রয়াসের প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্ক নেই। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আমাদের চতুষ্পার্শ্বের বিশ্ব ও অন্তর্জগত সম্পর্কে প্রকৃষ্টতর ধারণা লাভে বিজ্ঞান আমাদিগকে শুধু যে নির্দেশ দিতে পারে তাই নয়, দিয়েও থাকে। কিন্তু যেহেতু বিজ্ঞানের সম্পর্ক শুধুমাত্র প্রাকৃতিক তথ্য পর্যবেক্ষণের সঙ্গে এবং তথ্যগুলোর আন্তঃসম্পর্ক যেসব নিয়মের দ্বারা শাসিত মনে হয় তারই বিশ্লেষণের সঙ্গে সেজন্য জীবনের লক্ষ্য কী সে সম্পর্কে অভিমত দানের জন্য এবং এইভাবেই আমাদের সামাজিক আচরণের অনুসরণীয় বৈধ নির্দেশ প্রদানের জন্য বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করা যায় না। শুধুমাত্র পরোক্ষভাবে বিশেষ কতকগুলো প্রতিষ্ঠিত তথ্যের ভিত্তিতে অনুমানভিত্তিক যুক্তি-চিন্তার মাধ্যমে বিজ্ঞান এ ব্যাপারে

www.pathagar.com

আমাদেরকে পরামর্শদানের চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞান যেহেতু সর্বক্ষণ একটা পরিবর্তনের স্রোতে ধাবমান, নিয়তই প্রকৃতির নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কারের দ্বারা এবং পরিণামে, পূর্ব পরীক্ষিত তথ্যসমূহের নিরন্তর পুনর্ব্যাখ্যা ও পুনর্মূল্যায়নের দ্বারা প্রভাবিত, সে কারণে বিজ্ঞানের পরামর্শ দ্বিধাযুক্ত ও আকস্মিক এবং কখনো কখনো পূর্বপ্রদত্ত পরামর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত। সংক্ষেপে, এটা এ কথা বলারই সমর্থক যে, 'কল্যাণ' এবং 'সুখ' পেতে হলে মানুষের কী কর্তব্য কিংবা কী কর্তব্য নয় এ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলার ক্ষমতা বিজ্ঞানের কোনকালেই নেই। এবং এ-কারণেই বিজ্ঞান মানুষের মধ্যে নৈতিক চেতনার বিকাশে সহায়তা করতে পারে না (এবং আসলে সে চেষ্টাও করে না)। সংক্ষেপে, নীতিশাস্ত্র ও নৈতিকতার সমস্যাগুলো বিজ্ঞানের আওতাবহির্ভূত এবং বিপরীত পক্ষে এগুলো সম্পূর্ণভাবে ধর্মেরই ইখতিয়ারভুক্ত।

আমাদের পরিপার্শ্বে যেসব ক্ষণস্থায়ী পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে, সেসব পরিবর্তন নিরপেক্ষ নৈতিক মূল্যায়নের মান সঠিকভাবে হোক বা ভুল করেই হোক আমরা শুধু ধর্মীয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই পেতে পারি। আমি 'সঠিকভাবে' বা 'ভুল করে' শব্দগুলো ব্যবহার করেছি এ কারণে যে, আত্মনিরপেক্ষ যুক্তি-বিচারের সকল পদ্ধতি অনুসারে ধর্মের পক্ষে (যে কোন ধর্মের) তার পরাতত্ত্বমূলক সূত্রগুলোতে সর্বদাই ভুল করার সম্ভাবনা রয়েছে এবং পরিণামে ঐ সব সূত্র থেকে যেসব নৈতিক মূল্যের অনুসিদ্ধান্ত করা হয় তাতেও ভুলের সম্ভাবনা রয়েছে। এজন্য আমরা কোন্ ধর্ম গ্রহণ করবো বা বর্জন করবো, পরিণামে তা আমাদের যুক্তি-বিচারের দ্বারাই নির্ধারিত হবে। কারণ, এই যুক্তি-বিচারই আমাদেরকে বলে দেয় — ঐ ধর্মটি মানুষের দৈহিক ও আধ্যাত্মিক উভয়বিধ চূড়ান্ত চাহিদার সঙ্গে কতটুকু খাপ খায়। কিন্তু ধর্মের শিক্ষা বিচারে আমাদের যুক্তিধর্মী বৃত্তিগুলো প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা এ মৌলিক সত্যকে সামান্য মাত্র ক্ষুণ্ন করে না যে, শুধুমাত্র ধর্মই আমাদের জীবনকে একটা তাৎপর্য দান করতে সক্ষম এবং এভাবেই তা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনাপুঞ্জের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নৈতিক মূল্যের একটি রূপের সঙ্গে আমাদের চিন্তা ও আচরণের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য আমাদের মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে পারে। ভিন্নভাবে বলতে গেলে, ভালো কী এবং মন্দ কী সে সম্পর্কে মানুষের বিভিন্ন দলের মধ্যে ঐকমত্যের জন্য প্রয়োজনীয় একটা প্রশস্ত মিলনক্ষেত্র শুধুমাত্র ধর্মের মাধ্যমেই পাওয়া যেতে পারে। এবং মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে কোন প্রকার শৃঙ্খলার জন্য এ ধরনের ঐকমত্য যে একটি নিরঙ্কুশ এবং অপরিহার্য প্রয়োজন তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকতে পারে কি?

এই দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষের মধ্যে ধর্মীয় প্রেরণা তার আধ্যাত্মিক বিকাশের ইতিহাসে একটা পর্যায়মাত্র নয়, বরং তার সমস্ত নৈতিক চিন্তা এবং নৈতিকতার

www.pathagar.com

সমস্ত ধারণারই চূড়ান্ত উৎস। এটা আদি মানবের সহজ বিশ্বাসের ফল নয়, যা অধিকতর আলোকপ্রাপ্ত যুগ পশ্চাতে ফেলে এগিয়ে যেতে পারে; বরং সকল কালে এবং সকল পরিবেশে মানুষের প্রকৃত ও মৌলিক চাহিদার একমাত্র প্রতিকার এতেই আছে। অন্য কথায়, এটা একটা 'সহজাত বৃত্তি।'

তাই এ ধারণা যুক্তিসঙ্গত যে, লৌকিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র অপেক্ষা ধর্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে জাতীয় সুখ-সমৃদ্ধির সম্ভাবনা অসংখ্য গুণে বেশি। অবশ্য তার জন্য শর্ত আছে। সে শর্ত এই যে, এ ধরনের রাষ্ট্র যে ধর্মীয় মতবাদের উপর স্থাপিত হয় এবং যা থেকে সে তার ক্ষমতা ও কৃতিত্ব পায় সেই মতবাদটিতে থাকা চাই। প্রথমত, মানুষের জৈবিক ও সামাজিক চাহিদা পূরণের পূর্ব সুযোগ; দ্বিতীয়ত, মানব সমাজ সমগ্রভাবে যে ঐতিহাসিক ও মানসিক বিকাশের নিয়মধারার অধীন তার পূর্ণ স্বীকৃতি। এই দু'টি শর্তের প্রথমটি শুধু তখনি পূরণ সম্ভব, যদি সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় বিশ্বাসটি শুধুমাত্র মানুষের আধ্যাত্মিক প্রকৃতিকে মূল্যবান মনে না করে তার জৈবিক প্রকৃতিকেও মূল্যবান মনে করে — ইসলাম সন্দেহাতীতভাবে এ দুয়েরই মূল্য স্বীকার করে। দ্বিতীয় শর্তটি পূরণ সম্ভব-সামাজিক আচরণ যে রাজনৈতিক বিধানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে, তা যদি শুধু বাস্তব এবং স্বতঃসিদ্ধ না হয়ে সর্বপ্রকার অনমনীয়তা থেকেও মুক্ত হয়। কুরআন এবং সুন্নাহ্‌তে বিধৃত রাজনৈতিক বিধান সম্পর্কে আমরা আসলে ঠিক এই দাবিই করে থাকি।

পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে আমি এ দাবি সপ্রমাণে চেষ্টা করবো। কিন্তু যেহেতু শরীয়তী আইন প্রণয়নের সুযোগ, সীমা ও খুঁটিনাটি সম্পর্কে মুসলিম পণ্ডিতদের মধ্যেও ঐকমত্য নেই, সেজন্য এ কাজে আরও এগুলোর আগে ইসলামী আইনেরই ধারণা সম্পর্কে আমি কয়েকটি সাধারণ মন্তব্য করতে চাই।

ইসলামী আইনের পরিসর

এটা সুবিদিত যে, যেসব আইন গতানুগতিক মুসলিম ফিকাহ্‌র বিষয়বস্তু — তার সবগুলোর বুনিয়াদ আল-কুরআন এবং সুন্নাহ্‌র সুস্পষ্ট আদেশ এবং নিষেধাত্মক ভাষায় প্রকাশিত নির্দেশাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। 'ফিক্‌হী' রায়ের বেশিরভাগই যুক্তি-তর্কের বিভিন্ন অনুসিদ্ধান্তমূলক পদ্ধতির ফল মাত্র যার মধ্যে কিয়াসের (সাদৃশ্যের মাধ্যমে অনুসিদ্ধান্ত) ভূমিকা সবচাইতে সুস্পষ্ট। অতীত কালের মহান ফকিহ্‌বৃন্দ তাঁদের কুরআন এবং সুন্নাহ্‌ পাকের অধ্যয়নের ভিত্তিতেই তাঁদের আইন সম্পর্কিত সিদ্ধান্তগুলোতে পৌঁছতেন এবং ফিকাহ্‌র সর্বাগ্রগণ্য ব্যাখ্যায় তাঁদের দৃষ্টান্ত বিচার করলে এতে কোনও সন্দেহ থাকে না যে, এ অধ্যয়ন ছিল অতিশয় গভীর এবং বিবেকবুদ্ধিসম্মত। তা সত্ত্বেও এই

www.pathagar.com

ধরনের অধ্যয়নের ফল অনেক ক্ষেত্রেই ছিল ভীষণ রকমে মন্ময় (Subjective) অর্থাৎ, এ সব নির্ধারিত হতো একদিকে ইসলামে আইনের উৎসগুলোর প্রতি তাঁদের মনোভাব ও সে সবের ব্যাখ্যা দ্বারা, অন্যদিকে তাঁদের কালের সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবেশের দ্বারা, যেহেতু সেই পরিবেশ অনেক দিক দিয়ে আমাদের পরিবেশ থেকে ব্যাপকভাবে ভিন্নতর ছিল সেজন্য পূর্বোক্ত ডিডাকটিভ সিদ্ধান্তসমূহের কোনো কোনোটি আমরা বর্তমানকালে যে সব সিদ্ধান্তে পৌঁছে থাকি তা থেকে সম্ভবত পৃথক হতে বাধ্য। এটাই অন্যতম কারণ যার জন্য এত বিপুলসংখ্যক আধুনিক মুসলিম সমকালীন রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর ক্ষেত্রে গতানুগতিক ফিকাহ্ উদ্ভাবিত রায়গুলো প্রয়োগ করতে অনিচ্ছুক।

মূলত বিশেষ বিশেষ সমস্যার সমাধানে শরীয়ার বিধান প্রয়োগকে সহজ করে তোলাই ছিল এ সব রায়ের উদ্দেশ্য। অবশ্য কালের পরিবর্তনে এ সব রায় সাধারণ মানুষের মনে এক ধরনের নিজস্ব ধর্মীয় বৈধতা অর্জন করে এবং বহু মুসলমান এগুলোকে শরীয়ারই একটি অপরিহার্য অংগ বলে বিবেচনা করতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। সাধারণের এই দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনে যুক্তি দেওয়া হয় যে, শুধু আল-কুরআন এবং রসূল করীম (সা)-এর কথা ও কাজের লিখিত বিবরণ তথা সহীহ হাদীসেই যথেষ্ট পরিমাণ সুস্পষ্ট আইনী বিধান, আদেশ এবং নির্দেশ নেই, — আইনমূলক সম্ভাব্য সকল অবস্থা যার ইখতিয়ারে পড়ে এবং এ কারণেই অনুসিদ্ধান্তভিত্তিক যুক্তি-চিন্তার মাধ্যমে মূল আইনসমষ্টির পরিবর্ধন ও সম্প্রসারণ প্রয়োজন। অবশ্য শরীয়ার এ ধরনের যথেচ্ছ পরিবর্ধনের সামান্য অবকাশও আল-কুরআন অথবা সুন্নাহ্তে নেই এ উক্তির সত্যতা যেমন সন্দেহাতীত, তেমনি যে কোন ব্যক্তি যুক্তিসঙ্গতভাবেই বলতে পারেন যে, আল-কুরআন এবং সুন্নাহ্তে নিহিত সুস্পষ্ট নির্দেশাবলীর সীমাবদ্ধ পরিসর বিধাতার (Law-Giver) দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়ার ফল নয়; বরং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে আইনগত ও সামাজিক অনমনীয়তার বিরুদ্ধে একটা অত্যন্ত অপরিহার্য এবং উদ্দেশ্যমূলক রক্ষাকবচের ব্যবস্থা। মুসলিম পণ্ডিতদের একটা বিপুল অংশ শত শত বছর ধরে এই যুক্তিই দিয়ে এসেছেন। সংক্ষেপে, এ অনুমান যুক্তিসঙ্গত যে জীবনের ধারণাযোগ্য সকল সাময়িক অবস্থার খুঁটিনাটি শরীয়ার এলাকাভুক্ত হবে তা কখনো বিধাতার উদ্দেশ্য হতে পারে না। — যে চৌহদ্দির মধ্যে সমাজের বিকাশ সাধন হওয়া উচিত, খুঁটি পুঁতে আইনের সেই চৌহদ্দি ঠিক করে দেওয়াই যেন বিধাতার উদ্দেশ্য, তার বেশিও নয় কমও নয়। আইনের সঙ্গে জড়িত সম্ভাব্য বিপুল পরিমাণ অবস্থার মোকাবেলা করার জন্য সময়ের চাহিদা এবং পরিবর্তনশীল সামাজিক অবস্থার প্রয়োজনানুযায়ী প্রত্যেকটি ব্যাপারের পৃথক পৃথক মীমাংসার সুযোগ মানুষকে দেওয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

এ কারণে, ইসলামী চিন্তার বিভিন্ন মযহাবের ফিকাহ্‌র মাধ্যমে গড়ে ওঠা আইনী কাঠামো থেকে প্রকৃত শরীয়া অনেক বেশি সংক্ষিপ্ত এবং অনেক ছোট। যেহেতু শরীয়া আল্লাহ্ প্রদত্ত আইন সে কারণে সম্ভবত শরীয়াকে মন্ময় ধরনের (Subjective Nature) পণ্ডিতী অনুসিদ্ধান্তসাপেক্ষ বা অনুমান নির্ভর ব্যাপার বলে গণ্য করা যায় না; বরঞ্চ আল-কুরআন ও সুন্নাহ্‌র সুনির্দিষ্ট নির্দেশসমূহে তা সামগ্রিকভাবে প্রদত্ত হয়েছে বলেই গণ্য হবে — আইনের সুস্পষ্ট পরিভাষায় প্রকাশিত সেইসব নির্দেশে ঃ 'ইহা করো' 'ইহা করো না' এই এই কাজ ভালো এবং সেহেতু বাঞ্ছনীয়' 'অমুক অমুক কাজ মন্দ এবং সে কারণে বর্জনীয়', এইসব নির্দেশকে পারিভাষিক ভাষায় 'নুসুস (এক বচন 'নস') বলে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকৃতিগতভাবেই এগুলো পরস্পরবিরোধী ব্যাখ্যার অবকাশ থেকে মুক্ত। বস্তুত এখানকার ভাষার দিক দিয়েই এগুলো পুরোপুরিভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং দ্ব্যর্থবোধকতামুক্ত হওয়ায় এগুলোর ব্যাখ্যারই কোন প্রয়োজন নেই। সকল আরব শব্দতত্ত্ববিদ একমত যে, আল-কুরআন এবং সুন্নাহর 'নস' বলতে সেইসব নির্দেশকে (আহ্‌কাম) বোঝায় যার আশু উৎস হচ্ছে সেই স্বতঃপ্রমাণ (যাহির) ভাষা, যে ভাষায় এগুলো প্রকাশিত হয়েছে।[১] এ ধরনের সব ক'টি 'নস'-নির্দেশই এমনভাবে সূত্রবদ্ধ যে তা মানুষের সকল পর্যায়ের সামাজিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে পারে। পক্ষান্তরে ফকিহবৃন্দের আত্মগত (Subjective) সিদ্ধান্তের বহুলাংশ বিশেষ কোন সময় এবং মানসিকতার প্রতিফলন এবং সেই কারণে তা চিরকালের জন্য বৈধতার দাবি করতে পারে না। তাই শুধুমাত্র আল-কুরআন এবং সুন্নাহ্‌র নুসুস নিয়েই সমষ্টিগতভাবে ইসলামের প্রকৃত এবং চিরন্তন শরীয়া গঠিত। বিধাতা ভ্রান্তির অবকাশরহিত পরিভাষায় যা অবশ্য বলে বা অবৈধ হিসেবে নিষিদ্ধ বলে বিধিবদ্ধ করেছেন শুধুমাত্র তাই হচ্ছে শরীয়ার বিষয়বস্তু। অথচ বিধাতা ঘটনা ও কর্মের বহুতর বিস্তৃত এলাকার উল্লেখ করেন নি। — 'নসে'র পরিভাষায় না সে সব করতে হুকুম দেওয়া হয়েছে, না নিষেধ করা হয়েছে। বিধাতার অনুল্লিখিত এইসব ঘটনাবস্তু ও কার্য শরীয়ার দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী অবশ্যই অনুমোদনযোগ্য (মুবাহ্) বলে গণ্য করতে হবে।

পাঠক যেন মনে না করেন যে, উপরে যে মত উপস্থাপিত হয়েছে তা ইসলামী চিন্তার ইতিহাসে অভিনব। বস্তুত মহানবীর সাহাবাগণ এবং পরবর্তীকালে ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের অনেকে, বিশেষ করে আমাদের সমগ্র ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ ফকিহ্‌গণের অন্যতম হিসাবে বিবেচিত হওয়ার যথার্থ অধিকারী কর্ডোভার ইবনে হাজমও (৩৮৪-৪৫৭ হিজরী; ৯৯৪-১০৬৪

১. লিসানুল আরব, বৈরুত, ১৯৫৭ (১৩৭৫ হিঃ) ৭ম খণ্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

খৃষ্টাব্দ) এই অভিমত পোষণ করতেন। আলোচ্য সমস্যাটির দৃষ্টান্ত হিসেবে ইবনে হাজমের বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-মুহল্লার' ভূমিকা থেকে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত পরিচ্ছদগুলোর চাইতে সুস্পষ্ট আর কিছুই হতে পারে না ঃ

'সমগ্রভাবে-শরীয়ার বিষয়বস্তু হচ্ছে অবশ্যকরণীয় কর্তব্য (ফরয) যা বর্জন না করলে পাপ হয়, নিষিদ্ধ কর্ম (হারাম) যা করলে পাপ হয়, কিংবা অনুমোদনযোগ্য কাজ (মুবাহ্) যা করলে বা বর্জন করলে মানুষ পাপী হয় না। এই মুবাহ্ কাজগুলো তিন রকম — প্রথম, যে সব কাজ অনুমোদিত হয়েছে (মানজুর) অর্থাৎ যেসব কাজ করা ভালো কিন্তু না করায় কোন পাপ নেই; দ্বিতীয়ত, যে সব কাজ অবাঞ্ছিত (মকরূহ্) অর্থাৎ যে সব কাজ বর্জন করা ভালো, কিন্তু করলে কোন পাপ হয় না এবং তৃতীয়ত, যে সব কাজ অনুল্লিখিত রয়েছে (মুতলাক), — যা করায় বা না করায় ভালোও নেই, মন্দও নেই।

আল্লাহ্র রসূল বলেছেন ঃ 'যে সব ব্যাপারে আমি কিছু বলিনি, সে সব ব্যাপারে আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করো না; কারণ জেনে রেখো, তোমাদের পূর্বে বহু জাতি এ কারণে ধ্বংস হয়েছে যে, তারা তাদের নবীকে অতি বেশি প্রশ্ন করতো এবং তারপর (তাঁদের শিক্ষা সম্পর্কে) ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করতো। সুতরাং আমি যদি তোমাদেরকে কিছু আদেশ করি তোমাদের সাধ্যমত তা করো এবং আমি যদি তোমাদেরকে কিছু করতে নিষেধ করি তা বর্জন করো।'[২]

দীনী আইনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল মূলনীতিই উক্ত হাদীসটির আওতাভুক্ত। এতে দেখা যাচ্ছে, যে ব্যাপারেই মহানবী কিছু বলেন নি — আদেশ করেও নয়, নিষেধ করেও নয় — তাই অনুমোদনযোগ্য (মুবাহ্) অর্থাৎ তা নিষিদ্ধও নয়, অবশ্য কর্তব্যও নয়। যা কিছু তিনি করতে আদেশ করেছেন তাই অবশ্য কর্তব্য (ফরয) এবং যা কিছু তিনি নিষেধ করেছেন তাই অবৈধ (হারাম) এবং আমাদেরকে যা কিছু তিনি করতে আদেশ করেছেন আমরা শুধু আমাদের সাধ্যানুযায়ীই তা করতে বাধ্য।[৩]

যেহেতু প্রকৃত শরীয়া আল-কুরআন এবং সুন্নাহ্র স্বতঃপ্রমাণ পরিভাষায় প্রকাশিত আদেশ এবং নিষেধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, সে কারণে তা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং তাই সহজে বোধগম্য; এবং যেহেতু এটা আকারে এত ছোট সেজন্য এতে জীবনের প্রত্যেকটি অবস্থার উপযোগী খুঁটিনাটি আইন থাকতে পারে না — শরীয়ার উদ্দেশ্যও তা ছিল না। ফলত, বিধাতা চান যে আমরা মুসলমানরাই ইসলামের সারবস্তুর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমাদের ইজতিহাদ (স্বাধীন যুক্তি-বিচার) প্রয়োগের মাধ্যমে অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করি। অবশ্য

২. মুসলিম, আবূ হুরায়রা কর্তৃক বর্ণিত।

৩. আল মুহাল্লা, আবূ মুহম্মদ আলী ইবনে হাজম প্রণীত (কায়রো) ১৩৪৭ হিঃ) ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬২-৬৪।

www.pathagar.com

এ কথা মনে রাখতে হবে যে, আল-কুরআন এবং সুন্নাহ্‌র প্রেরণায় আমরা যে ইজতিহাদী আইনই সৃষ্টি করি না কেন (কোন কোন ক্ষেত্রে হয়তো বিগত যামানাসমূহের ইজতিহাদের সাহায্য নিয়ে), তা সব সময়েই আমাদের পরবর্তীদের ইজতিহাদ দ্বারা সংশোধিত হতে পারে; অর্থাৎ এটা আল-কুরআন এবং সুন্নাহ্‌র নুসুসে স্বতঃপ্রমাণ সংশোধনাতীত ও অপরিবর্তনীয় শরীয়ার আওতাধীন লৌকিক এবং পরিবর্তনযোগ্য আইন ছাড়া কিছুই নয়।

শরীয়া পরিবর্তন করা যায় না। কারণ তা আল্লাহ-প্রদত্ত আইন এবং এটা পরিবর্তনের কোন প্রয়োজনও নেই। কারণ এর সকল নির্দেশই এমনভাবে সূত্রবদ্ধ যে কোন সময়েই প্রকৃত ফিতরাত এবং মানব সমাজের অকৃত্রিম প্রয়োজনগুলোর সঙ্গে এ সব নির্দেশের কোনটিরই বিরোধ বাধতে পারে না — শুধুমাত্র এ কারণে যে, শরীয়া মানব জীবনের যে দিকগুলো স্বভাবতই পরিবর্তনের ঊর্ধ্বে সেগুলো সম্পর্কেই বিধান দিয়ে থাকে। আল্লাহ্-প্রদত্ত আইনের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য — মানবিক উৎকর্ষের সকল পর্যায়ে ও সকল অবস্থায় এর প্রযোজ্যতা — এতে আগে থেকেই স্বীকার করে নেওয়া হয় যে, শরীয়ার নির্দেশাবলীর আওতায় প্রথমত, শুধু সাধারণ মৌলিক নীতিগুলোই পড়ে (তাতে করেই খুঁটিনাটি ব্যাপারে সময়ের প্রয়োজনানুযায়ী পরিবর্তনের স্বীকৃতি দেয়া হয়) এবং দ্বিতীয়ত, মানুষের সামাজিক বিকাশজনিত পরিবর্তনের দ্বারা যে সব ব্যাপার প্রভাবিত হয় না, শরীয়া সে সব ক্ষেত্রে বিশদ আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা করে। নুসুসের প্রসঙ্গ বিচার করে দেখলে দেখা যাবে, এই ধারণা নির্ভুল। যখনি বিশদ নস্-আইন এসেছে দেখা যায় নিয়তই তা আমাদের ব্যক্তিক ও সামাজিক জীবনের এমন সব দিকের সঙ্গে সম্পর্কিত যা সকল প্রকার কালগত পরিবর্তন থেকে মুক্ত (যেমন মানব প্রকৃতি ও মানবিক সম্পর্কের মৌলিক উপাদানসমূহ)। পক্ষান্তরে, যখনি মানুষের প্রগতির জন্য পরিবর্তন অপরিহার্য (দৃষ্টান্তস্বরূপ শাসনকার্য, কারিগরি বিদ্যা, অর্থনৈতিক ইত্যাদি ব্যাপারে) শরীয়া তখন কোনো বিশদ আইনের ব্যবস্থা দেয় না, শুধু সাধারণ মূলনীতি নির্দেশ করে অথবা কোন আইন প্রণয়ন থেকে বিরত থাকে। এবং এখানেই ইজতিহাদী আইন প্রণয়ন কার্যের বৈধ এলাকায় পড়ে ঃ (১) সে সব বিষয় এবং অবস্থার খুঁটিনাটি — যে সব ব্যাপারে শরীয়া সাধারণ মৌলিক নীতি নির্দেশ করে বিশদ রায় দেয় না। (২) এবং যে সব ব্যাপার মুবাহ্ অর্থাৎ শরীয়ার আইনের ইখতিয়ারভুক্ত নয় — তেমন সব বিষয় সম্পর্কিত নীতির খুঁটিনাটি।

এই পদ্ধতির কথাই আল-কুরআন নিম্নলিখিত ভাষায় ঘোষণা করেছে ঃ **لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا** — 'তোমাদের প্রত্যেকের জন্য

www.pathagar.com

আমি এক একটি শরীয়ার ব্যবস্থা দিয়েছি এবং একটি মুক্ত পথের।'[৪] তাই মুসলিম জীবন যে এলাকার মধ্যে বিকশিত হতে পারে শরীয়া যেমন তার সীমা নির্ধারণ করে, তেমনি বিধাতা এই এলাকার অভ্যন্তরেই আমাদেরকে বৈষয়িক আইন প্রণয়নের জন্যে একটা মুক্ত পথ (মিনহাজ) দিয়েছেন, যার মধ্যে পড়বে আল-কুরআন ও সুন্নাহর নসুসের আওতার বাইরে ইচ্ছাকৃতভাবে রেখে দেওয়া সম্ভাব্য সকল বিষয়।

স্বাধীন জিজ্ঞাসার প্রয়োজন

বর্তমান সময়ে, যখন মুসলিম জগত এমন একটি সাংস্কৃতিক সংকটে ক্লিষ্ট যা একটা ব্যবহারিক ব্যবস্থা হিসাবে ইসলামের উপযোগিতাকে আগামী বহু শতাব্দীর জন্য হয় প্রতিষ্ঠিত করতে, না হয় নস্যাত করে দিতে পরে — এই মুহূর্তে ইসলামের উন্মুক্ত পথটির পুনরুদ্ধার অতিশয় প্রয়োজনীয়। একটা দ্রুত পরিবর্তনশীল জগতের মাঝখানে আমরা যেহেতু রয়েছি, আমাদের সমাজও পরিবর্তনের সেই অখণ্ডনীয় নিয়মের অধীন। আমরা পছন্দ করি বা না করি, একটা পরিবর্তন আসবেই এবং পরিবর্তন আসলে ইতিমধ্যেই আমাদের চোখের সামনে সংঘটিত হয়ে চলেছে; এই সত্যটি যেমন সুস্পষ্ট, তেমনি তা বিপুল মহত্তর অথবা মন্দতর সম্ভাবনায় পূর্ণ। 'মহত্তর' অথবা 'মন্দতর' এই শব্দ দুটোর উপর জোর দেওয়ার প্রয়োজন আছে; কারণ আমাদের কিছুতেই ভুললে চলবে না যে, 'পরিবর্তন' হচ্ছে 'গতি' শব্দটিরই একটি প্রতিশব্দ মাত্র এবং কোন সমাজসত্তার অভ্যন্তরে গতি সৃজনশীল অথবা ধ্বংসাত্মক উভয়ই হতে পারে। আল-কুরআন এবং সুন্নাহ্তে বিধৃত সত্যগুলোতে প্রত্যাবর্তনের প্রয়াস এবং সে সবের উপর ভিত্তি করে আমাদের রাজনৈতিক চিন্তা ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপের জন্য নতুন পথের অনুসন্ধান হচ্ছে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রথমোল্লিখিত ধরনের গতিশীলতার অনুরূপ। পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণা ও অনুষ্ঠানাবলীর প্রতি মুসলিম সমাজের বর্তমান ঝোঁক দ্বিতীয় ধরনের গতিশীলতার প্রমাণ। আমাদের উপযোগী হলে এই ঝোঁককে আমরা অব্যাহত রাখতে পারি এবং ক্রমে সভ্যতার একটা স্বতন্ত্র উপাদান হিসেবে ইসলামকে বিলুপ্ত হতে দিতে পারি অথবা ইচ্ছে করলে আমরা ইসলামের সামাজিক-রাষ্ট্রীয় কর্মসূচীর ভিত্তিতে একটি নতুন সূচনা করতে পারি এবং তাতে করে পতন ও ক্ষয়িষ্ণুতার হিমশীতল ছাই-ভস্ম থেকে আমাদের সংস্কৃতির পুনরুত্থান ঘটাতে পারি।

---

৪. আল-কুরআন, ৫ ঃ ৪৮

www.pathagar.com

অবশ্য যদি আমরা শেষোক্ত বিকল্পটিকে গ্রহণ করি সে অবস্থায় আমাদের পক্ষে এ কথা বলাই যথেষ্ট নয় যে, 'আমরা মুসলিম এবং সেহেতু আমাদের একটি নিজস্ব আদর্শ আছে।'

আমাদের চতুর্দিক থেকে যে সব প্রতিকূল সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রভাব আমাদের উপর এসে পড়ছে, এ আদর্শ যে শুধু তার চাপ প্রতিরোধ করার মতো যথেষ্ট জীবনীশক্তি রাখে তাই নয়, এমন কি আজও তা আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজ-সংগঠনের ব্যাপারে আমাদেরকে সঠিক পথের নির্দেশ দিতেও পারে, তা আমাদের নিজের কাছে এবং বিশ্বের কাছে প্রমাণেরও সামর্থ্য অবশ্যি থাকা চাই। এ কাজে সমর্থ হওয়ার জন্যে ইসলামের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আইন সম্পর্কে যা আগেকার যমানার মুসলমান পণ্ডিতদের কাছে 'চূড়ান্ত' রায় বলে প্রতীয়মান হয়েছে, তার উপর আমাদের বন্ধ্যা-নির্ভরতা অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে এবং আমাদের মূল উৎসগুলোর অধ্যয়ন ঐ বিচার-বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সৃজনধর্মী পদ্ধতিতে এ সব সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে শুরু করতে হবে।

আমরা যদি মুক্ত জিজ্ঞাসার এই মনোভাব নিয়ে আমাদের সমস্যার মুকাবিলা করি, তাহলে আমরা দু'টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছাবো — প্রথমত, ইসলামী আইনের ধারণা, বিশেষ করে সাধারণ আইনের (public Law) ধারণা পুনরায় সেই সরলতা অর্জন করবে, আইনের যে সরলতা ছিল বিধাতার অভিপ্রেত, কিন্তু পরবর্তীকালে যা গতানুগতিক এবং প্রায়শ খেয়ালখুশি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের বহু স্তরের নীচে চাপা পড়ে গেছে; দ্বিতীয় এবং আমাদের বর্তমান সমস্যার ব্যাপারে এটাই সবচেয়ে বেশি প্রাসঙ্গিক — ইসলামী রাষ্ট্রের বাহ্যরূপ এবং কর্মপ্রণালী হুবহু কোনো 'ঐতিহাসিক পূর্ব দৃষ্টান্তের' অনুরূপ হওয়া আবশ্যিক নয়। কোনো রাষ্ট্র যাতে ইসলামী রাষ্ট্ররূপে বর্ণিত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে, সেজন্য সেই রাষ্ট্রের সংবিধান এবং আচরণে শুধু ইসলামের সেই সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থবোধকতামুক্ত নির্দেশগুলোরই অন্তর্ভুক্তি প্রয়োজন, সমাজের সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে যার সম্পর্ক প্রত্যক্ষ। ব্যাপার এই যে, ঐ বিধানগুলো অতিশয় স্বল্পসংখ্যক এবং অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে সূত্রবদ্ধ এবং অপরিবর্তনীয়ভাবেই এগুলোর প্রকৃতি এরূপ যে, যে কোনো বিশেষ কাল ও সামাজিক অবস্থার চাহিদা মেটানোর সম্ভাব্য বৃহত্তম অবকাশ এগুলোতে রয়েছে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

পরিভাষা ও ঐতিহাসিক পূর্ব-দৃষ্টান্ত

পাশ্চাত্য পরিভাষার অপপ্রয়োগ

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার ধারণা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হওয়া সত্ত্বেও এ ধারণাকে বোঝাতে গিয়ে এর সমর্থক ও বিরোধী উভয় দল কর্তৃক পাশ্চাত্য রাষ্ট্রনৈতিক পরিভাষা ও সংজ্ঞার যথেচ্ছ ব্যবহার ইসলামী রাষ্ট্রের ধারণা সম্পর্কে বিভ্রান্তির একটি প্রধান কারণ। আধুনিক মুসলমানদের রচনায় এ দাবি বিরল নয় যে, 'যা ইসলামসম্মত তা-ই গণতান্ত্রিক', এমনকি এ দাবিও বিরল নয় যে, 'সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠাই ইসলামের লক্ষ্য', — যদিও প্রতীচ্যের বহু লেখক ইসলামের মধ্যে এক ধরনের কল্পিত 'সমূহবাদের' উল্লেখ করে থাকেন, যার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হচ্ছে স্বেচ্ছাতন্ত্র। রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে সংজ্ঞাদানের এহেন প্রয়াস যে শুধু পরস্পরবিরোধী এবং সেহেতু, গুরুতর আলোচনার পক্ষে ব্যবহারিক মূল্যহীন, তাই নয়, শুধুমাত্র প্রতীচ্যের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলিম সমাজের সমস্যাকে দেখার এবং এভাবে ঘটনার মুকাবিলার বিপদও এতে লিখিত রয়েছে। কারণ, এ সব ঘটনা পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সমর্থনীয় বা অসমর্থনীয় হতে পারে অথচ বিশ্ব সম্পর্কে ইসলামের যে দৃষ্টিভঙ্গি তার মধ্যে তা একেবারে অপ্রাসংগিক হওয়াও অসম্ভব নয়। আমাদের মনে রাখা উচিত, কোন ইউরোপীয় বা আমেরিকান যখন গণতন্ত্র (Democracy), উদারনৈতিকতাবাদ (Liberalism), সমাজতন্ত্র (Socialism) ধর্মতন্ত্র, (Theocracy), পার্লামেন্টারী সরকার ইত্যাদি সম্পর্কে কথা বলে, তখন সে প্রতীচ্যের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার পটভূমিতেই এই শব্দগুলো প্রয়োগ করে। এই পটভূমিকায় এসব শব্দের যে শুধু ন্যায্য স্থানই আছে তা নয়, এগুলো সহজে বোধগম্যও বটে। যা বাস্তবে ঘটেছে কিংবা প্রতীচ্যের বিকাশধারায় যা ঘটতে পারে এবং সেহেতু মানুষের সমস্ত ধারণা কালের আবর্তনজনিত যে সব পরিবর্তনের অধীন সেগুলো থেকে যা বেঁচে থাকতে পারে উক্ত শব্দগুলোর উচ্চারণ মাত্রই তার মানসিক চিত্র জাগ্রত হয়। অধিকন্তু, ধারণা যে পরিবর্তনশীল সে তথ্য প্রতীচ্যের চিন্তাবিদদের মনে সদা জাগরূক; তথ্যটি

www.pathagar.com

এই যে, বর্তমানে প্রচলিত রাষ্ট্রনৈতিক পরিভাষাসমূহের অনেকগুলোই এমন অর্থ বহন করে, যা এ সব পরিভাষার আদি অর্থ থেকে স্বতন্ত্র। পাশ্চাত্য চিন্তাবিদদের এই সচেতনতা তাঁকে তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক পরিভাষাকে নিয়ত সংশোধনীয় ও পুনর্বিন্যাসরূপে দেখবার ক্ষমতা দিয়ে থাকে। কিন্তু যখনই কোন রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা বা ধারণাকে এমন কোন জাতি রেডীমেড বা তৈরি জিনিসরূপে গ্রহণ করে, যার সভ্যতা খুবই ভিন্ন এবং সে কারণে যার ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা স্বতন্ত্র তখনই চিন্তার এই নমনীয়তা অন্তর্নিহিত হয়। এহেন জাতির কাছে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রনৈতিক পরিভাষা বা প্রতিষ্ঠানটি সাধারণত অবিমিশ্র এবং অপরিবর্তনীয় অর্থযুক্ত বলে মনে হয় — যে অর্থ উক্ত পরিভাষা বা প্রতিষ্ঠানটির বিবর্তনধর্মিতা যে একটি বাস্তব ব্যাপার, তা স্বীকার করে না এবং পরিণতিস্বরূপ রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তায় একটু অনমনীয়তাই এনে দেয় — যদিও এই অনমনীয়তাকে দূর করাই ছিল নতুন ধারণাটি গ্রহণ করার উদ্দেশ্য।

দৃষ্টান্তস্বরূপ ডিমোক্রেসী (Democracy) শব্দটি লওয়া যাক। ফরাসী বিপ্লবও শব্দটিকে যে অর্থ দান করেছিল এখনো সম্পূর্ণভাবে না হলেও বহুলাংশে প্রতীচ্যে সে অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ফরাসী বিপ্লবের দেয়া ডিমোক্রেসীর মানে হচ্ছে — সকল নাগরিকের সামাজিক, অর্থনৈতিক সাম্যের নীতি এবং 'মাথাপিছু একটি ভোটের' ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সমগ্র জনসংখ্যার প্রাপ্তবয়স্ক অংশ কর্তৃক সরকার পরিচালনের নীতি। ব্যাপকতর তাৎপর্যের দিক দিয়ে এই শব্দটির দ্বারা জনসাধারণের সাথে সম্পর্কিত সকল ব্যাপারে সংখ্যাগুরুর ভোট মারফত আইন প্রণয়নে জনসাধারণের অবাধ অধিকার বোঝায়। এভাবে, নিদেনপক্ষে তত্ত্বের দিক দিয়ে হলেও, জনসাধারণের ইচ্ছাই (Will of the people) সমস্ত বাহ্য নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত 'স্বয়ং সার্বভৌম' এবং শুধুমাত্র নিজের প্রতি দায়িত্বশীল রূপে উপস্থাপিত হয়েছে। বলা বাহুল্য যে, ডিমোক্রেসীর এ ধারণা এ পরিভাষাটির উদ্ভাবক প্রাচীন গ্রাসিয়দের ধারণা থেকে বহুলাংশে আলাদা। তাদের কাছে, 'জনগণের শাসন অথবা জনসাধারণের দ্বারা পরিচালিত শাসন" দ্বারা (যা ডিমোক্রেসী বা গণতন্ত্র শব্দটির নিহিত তাৎপর্য) একটা নিরেট ক্ষুদ্র গোষ্ঠী পরিচালিত (Oligarchic) সরকার-পরিচালন ব্যবস্থাই বোঝাতো। তাদের নগর-রাষ্ট্রগুলোতে (City-state) 'জনসাধারণ' (people) ছিল নাগরিকের সমার্থক (Citizens) অর্থাৎ রাষ্ট্রের স্বাধীন ব্যক্তি হিসেবে জাত অধিবাসীরাই ছিল 'নাগরিক' বা জনসাধারণ এবং এদের সংখ্যা কচিৎ কখনো মোট জনসংখ্যার এক-দশমাংশকে অতিক্রম করতো। অবশিষ্ট সকলেই ছিল ক্রীতদাস এবং ভূমিদাস, যাদেরকে কায়িক পরিশ্রম ছাড়া অন্য কোন কাজ করার অনুমতি দেওয়া হতো না; প্রায়ই তাদেরকে সামরিক কার্যে

www.pathagar.com

বাধ্য করা হলেও তাদের কোন নাগরিক অধিকারই ছিল না। শুধুমাত্র জনসংখ্যার উপরিতম ক্ষীণ স্তরটিরই অর্থাৎ নাগরিকদেরই সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় ভোটাধিকার ছিল এবং এভাবে সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল তাদের হাতেই কেন্দ্রীভূত। এই ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে আধুনিক প্রতীচ্যে Democracy বা গণতন্ত্রের যে ধারণা প্রচলিত তা প্রাচীন গ্রীসের লিবার্টি'র ধারণার চেয়ে বহু বহুগুণে ইসলামেরই নিকটতর। কারণ ইসলাম এ মত পোষণ করে যে, সামাজিক দিক দিয়ে সকল মানুষ সমান এবং এ কারণে প্রত্যেককেই বিকাশ ও আত্মপ্রকাশের সমান সুযোগ অবশ্য দিতে হবে। অন্যদিকে ইসলাম মুসলমানদেরকে তাদের সিদ্ধান্তসমূহ আল-কুরআনে প্রত্যাদিষ্ট এবং মহানবী কর্তৃক আচরিত ঐশী আইনের নির্দেশের অধীন রাখতে বাধ্য করে। এ বাধ্যবাধকতা সমাজের আইন প্রণয়নের অধিকারের উপর নিশ্চিত সীমা আরোপ করে এবং জনসাধারণের ইচ্ছার সেই সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করে, যা প্রতীচ্যের গণতন্ত্রের ধারণার একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ইসলামের সঙ্গে বাহ্যত সদৃশ একটা প্রবণতা ইউ.এস. এস.আর. ও অন্যান্য কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রে প্রচলিত আদর্শিক গণতন্ত্রের ধারণায় লক্ষ্য করা যেতে পারে। ইসলামের মতো ঐসব রাষ্ট্রেও নিজেদের জন্য জনসাধারণের আইন প্রণয়নের অধিকারের উপর আদর্শকে স্থান দেওয়া হয়ে থাকে। শুধুমাত্র ঐ আদর্শের কাঠামোর মধ্যেই সংখ্যাগুরুর ভোট কার্যকরী হতে পারে। অবশ্য এইমাত্র যেমন বলা হয়েছে, এ সাদৃশ্য বাহ্যিক মাত্র; আর এর প্রথম কারণ এই যে, ইসলামের সমস্ত আদর্শিক ধারণার ভিত্তি হচ্ছে একটা ঐশী আইন, বিশ্বাসীর কাছে নৈতিকতার দিক দিয়ে যা চূড়ান্ত ও অপরিবর্তনীয়ভাবে বাধ্যতামূলক, যদিও কমিউনিজমের আদর্শ মানবিক মতবাদজাত বলেই স্বীকৃত এবং সেইহেতু অতিশয় সুদূরপ্রসারী সংশোধন পরিবর্তনের অধীন এবং দ্বিতীয় কারণ এই যে, ইসলাম তার আইনের ব্যাখ্যা ও ধারণার জন্য ব্যক্তির জ্ঞান এবং বিবেকের উপরই নির্ভরশীল হতে মানুষকে শিক্ষা দেয় এবং অন্য কোন ব্যক্তি বা সংগঠিত সংস্থার ব্যাখ্যাকে নৈতিকতার দিক দিয়ে বাধ্যতামূলক বলে গ্রহণ করতে বাধ্য করে না। (মুসলিম ইতিহাসে বারবার এই নীতিকে ভঙ্গ করা হলেও এ ব্যাপারে ইসলামের শিক্ষা দ্ব্যর্থবোধকতামুক্ত।)

উপরে যা বলা হয়েছে তাতে এটা পরিষ্কার যে, প্রতীচ্যেও 'গণতন্ত্র' ও 'গণতান্ত্রিক অধিকার' শব্দ দু'টো ব্যাপকভাবে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে ও হচ্ছে। ইসলামের রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শের ক্ষেত্রে ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক অর্থে এই পরিভাষাগুলোর প্রয়োগ অনিবার্যভাবেই একটা অস্পষ্টতা এবং তৎসহ শব্দ নিয়ে কারচুপি করার প্রবণতা সৃষ্টি করে।

www.pathagar.com

পাশ্চাত্য চিন্তায় যে সব পরিভাষার একটা খাঁটি অর্থাৎ ইতিহাসসম্মত ভূমিকা রয়েছে — কিন্তু ইসলামী আদর্শের ক্ষেত্রে যা চূড়ান্তভাবে অস্পষ্ট ও বিভ্রান্তিকর এমন সব আরো বহু সামাজিক-রাষ্ট্রিক পরিভাষা সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কেউ এ দাবি করতে পারে (যেমন কোন কোন আধুনিক মুসলিম লেখক করে থাকেন) যে, ইসলাম তার প্রকৃতির দিক দিয়ে 'সমাজতান্ত্রিক' কারণ এমন একটা ব্যবস্থা ইসলামের লক্ষ্য, যা সকল নাগরিকদের জন্য সমান সুযোগ, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এবং জাতীয় সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বন্টনের ব্যবস্থা করবে। অবশ্য, একই রকম আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এ দাবিও একজনের পক্ষে করা সম্ভব যে, 'ইসলাম' 'সমাজতন্ত্রের বিরোধী — যদিও সমাজতন্ত্র বলতে বোঝায়, (যেমন সন্দেহাতীতভাবে মার্কসবাদী সমাজতন্ত্র বুঝিয়ে থাকে) সমগ্র সামাজিক জীবনের একটা কঠোর নিয়ন্ত্রণ (Regimentation), নৈতিকতার উপর অর্থনীতির প্রাধান্য এবং নিছক একটা অর্থনৈতিক উপাদানরূপে ব্যক্তির মূল্য। এমন কি, ইসলামের লক্ষ্য Theocracy বা ধর্মতন্ত্র কিনা তার উত্তরেও 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' বলা সম্ভব নয়। এর উত্তর হবে 'হ্যাঁ'-বাচক, যদি ধর্মতন্ত্র বলতে আমরা এমন একটা সমাজ ব্যবস্থা বুঝাই, যেখানে চূড়ান্ত পর্যায়ে সমস্ত জাগতিক আইনই, সমাজ যাকে ঐশী আইন বলে মনে করে, তা থেকে উৎসারিত। কিন্তু যার লক্ষ্য হচ্ছে একটা পুরোহিত শ্রেণীর হাতে চূড়ান্ত রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা ন্যস্ত করা। কেউ যদি মধ্যযুগের ইউরোপীয় ইতিহাসে বহু পরিচিত সেই চেষ্টার সঙ্গে Theocracy বা ধর্মতন্ত্রকে সমর্থক মনে করেন, তাহলে তার জবাবটা হবে একটা প্রকাণ্ড 'না', — এবং তার সোজা কারণ এই যে, ইসলামে পুরোহিত বা যাজক-প্রথা নেই এবং তার ফলস্বরূপ খৃষ্টান চার্চের (অর্থাৎ কতকগুলো আপ্তবাক্য এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানের একটা সুসংবদ্ধ সংহিতার) সদৃশ কোন সংস্থা নেই। যেহেতু প্রত্যেকটি ধর্মীয় কাজ সম্পাদনের অধিকার প্রত্যেকটি প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমানেরই রয়েছে, সে জন্যে কোন ব্যক্তি বা দলের উপর ধর্মীয় কাজ সম্পাদনের ভার সমর্পণ করলেই সে আইনত বিশেষ কোন পবিত্র মর্যাদার দাবি করতে পারে না। তাই প্রতীচ্যে থিওক্রেসী বলতে যা বোঝায়, ইসলামী পরিবেশে তা সম্পূর্ণ অর্থহীন।

সংক্ষেপে বলা যায়, ইসলামী ধ্যান-ধারণা ও প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অনৈসলামিক পরিভাষার প্রয়োগ অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর। ইসলামী আদর্শের একটা সুনির্দিষ্ট সামাজিক রূপ আছে, যা ইসলামেরই নিজস্ব এবং আধুনিক প্রতীচ্যের সামাজিক আদর্শ থেকে বহু দিক দিয়ে স্বতন্ত্র এবং ইসলামের এই আদর্শকে শুধুমাত্র তার নিজস্ব পটভূমিকায় এবং নিজস্ব পরিভাষায়ই সাফল্যের সঙ্গে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। এই মূলনীতি থেকে সামান্য বিচ্যুতিও আমাদের কালের বহু

www.pathagar.com

জ্বলন্ত সমস্যার প্রতি ইসলামী আইনের মনোভাবকে অনিবার্যভাবেই অস্পষ্ট ও আচ্ছন্ন করে তোলে।

ইসলামী রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান

অবশ্য ইসলামী রাষ্ট্রীয় চিন্তার ক্ষেত্রে অনৈসলামিক পরিভাষার প্রয়োগই ইসলামের রাষ্ট্রীয় বিধানের জিজ্ঞাসু পাঠকের পথে একমাত্র বিঘ্ন নহে; সম্ভবত আমাদের ভবিষ্যত উন্নতি-প্রগতির নির্দেশক হিসেবে ঐতিহাসিক পূর্ব-দৃষ্টান্তের উপর বিপুলসংখ্যক মুসলমানের নির্ভরতা আরও বেশি বিপজ্জনক।

রাষ্ট্র মাত্রই তার অধিবাসীদের সুখ ও কল্যাণ বিধান করতে চাইলে তার যে সব অপরিহার্য বুনিয়াদী কর্তব্য রয়েছে তার একটির উপর পূর্ববর্তী অধ্যায়ে জোর দেয়া হয়েছে। সে কর্তব্যটি এই যে, মানুষের সামাজিক এবং মানসিক বিকাশের পূর্ণ সুযোগ দিতে হবে এবং এইভাবে রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তায় অনড়তার পাশ কাটিয়ে যেতে হবে। মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের অতীত ইতিহাসের দিকে এবং একটা আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্রের রূপ ও কর্তব্য সম্পর্কে হাল আমলের কতিপয় সুপরিচিত ধারণার দিকে তাকিয়ে আমরা সহজে অনড়তার সেই উপাদানটিকে প্রত্যক্ষ করতে পারি, যা একটা সুস্থ সামাজিক বিকাশের দাবি ও প্রয়োজনগুলোর সঙ্গে স্বভাবতই অসামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হয়। এ ব্যাপারে আমি রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্বের উপর শুধু প্রাচীন মুসলিম লেখকদের গ্রন্থাবলীরই উল্লেখ করছি না — এ সব গ্রন্থ সাধারণত আব্বাসীয় আমলে বিদ্যমান রাজনৈতিক অবস্থাসমূহের চিত্র প্রতিফলিত করে এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে তখনকার কালের শাসকদের স্বার্থরক্ষা করার ব্যগ্রতাই প্রকাশ করে — আমি এখানে, বিশেষ করে অতীতে এবং বর্তমানকালে বহু মুসলমানের মধ্যে সক্রিয় একটি ধারণার কথা উল্লেখ করছি যে ধারণায় মনে করা হয়, 'ইসলামী' এই বিশেষণে বিশেষিত হতে পারে এমন রাষ্ট্রের রূপ শুধু একটিই হতে পারে — অর্থাৎ খোলাফায়ে রাশেদার চার খলীফার আমলে যে রূপ প্রকাশ পেয়েছে ইসলামী রাষ্ট্রের রূপ তাই হতে পারে এবং সে আদর্শ থেকে সামান্য বিচ্যুতি ঘটলেই রাষ্ট্রের ইসলামী চরিত্র অবশ্যই লোপ পাবে। এই ধারণার চাইতে ভ্রমাত্মক আর কিছুই হতে পারে না।

আমরা যদি আল-কুরআন ও সুন্নাহ্‌র রাষ্ট্রনীতিক নির্দেশগুলোর বস্তুনিষ্ঠ বিচার করি, দেখতে পাব, এগুলো রাষ্ট্রের কোন বিশেষ রূপ লিপিবদ্ধ করে না অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্র কোন্ বিশেষ আদর্শ মেনে চলবে শরীয়া তার কোন ছক দেয় না কিংবা সংবিধানের কোন বিশদ তত্ত্ব এতে মেলে না। তা সত্ত্বেও আল-কুরআন এবং সুন্নাহ্‌র পাঠ থেকে যে রাষ্ট্রনৈতিক বিধান উদ্ভূত হয় তা মায়া নয়, এ কারণে এটা অত্যন্ত স্পষ্ট এবং বাস্তব যে, এতে আমরা রাষ্ট্রনৈতিক পরিকল্পনার

www.pathagar.com

এমন একটা রূপরেখা পাই সর্বকালে এবং মানব জীবনের সর্বাবস্থায় যার রূপায়ণ সম্ভব। কিন্তু যেহেতু উদ্দেশ্যই এই ছিল যে, এ বিধান সর্বকালে ও সর্বাবস্থায় কার্যকরী হবে, শুধুমাত্র এ কারণেই এ পরিকল্পনার শুধু রূপরেখা দেয়া হয়েছে, খুঁটিনাটি দেয়া হয় নি। মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনসমূহ সময়-নির্ভর এবং সে কারণে অত্যন্ত পরিবর্তনশীল। অনড় অনমনীয়ভাবে স্থিরীকৃত আইনকানুন ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষে পরিবর্তনের এই স্বাভাবিক প্রবণতার প্রতি সুবিচার করা বোধ হয় সম্ভব নয় এবং সে কারণে 'শরীয়া' এ অসম্ভবের চেষ্টা করে না। এটা ঐশী বিধান বলেই, এটা ন্যায়সঙ্গতভাবেই ঐতিহাসিক বিবর্তনের সত্যটিকে আগাম বিবেচনা করে এবং বিশ্ববাসীকে অতিশয় সীমাবদ্ধসংখ্যক কয়েকটি প্রশস্ত রাজনৈতিক মূলনীতি ছাড়া আর কোন ব্যাপারে বাধ্য করে না। এগুলো ছাড়া 'শরীয়া' শাসন-সংবিধান তৈরি, সরকার পরিচালনা পদ্ধতি এবং দৈনন্দিন আইন প্রণয়নের একটা বিশাল ক্ষেত্রকে ইজতিহাদের উপর ছেড়ে দিয়েছে।

আমাদের সামনে যে সমস্যা রয়েছে, তার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে আমরা নিরাপদে বলতে পারি যে, ইসলামী রাষ্ট্রের শুধু একটা নয়, বহু রূপ হতে পারে এবং প্রত্যেক মুসলমানেরই দায়িত্ব হচ্ছে তাদের যুগের উপযোগী রূপটি আবিষ্কার করা। অবশ্য তার একটি শর্ত আছে; সে শর্তটি এই যে, তারা যে রূপ এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ বেছে নেবে সেগুলো সামাজিক জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত 'শরীয়া'র সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থবোধকতামুক্ত বিধানসমূহের সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া চাই।

শরীয়া'র রাষ্ট্রনীতিমূলক এ সব আইনের (যা এক্ষুণি বিশদভাবে আলোচিত হবে) পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছিল খোলাফায়ে রাশেদার প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান এবং পদ্ধতিসমূহের মধ্যে এবং এ কারণেই তাঁদের রাষ্ট্র সকল অর্থেই ছিল ইসলামী রাষ্ট্র। অবশ্য আমাদের বিস্মৃত হলে চলবে না যে, সেকালের ইসলামী সাধারণতন্ত্র যে লিখিত সংবিধান অনুসরণ করেছে, তাতে রাষ্ট্র-পরিচালনা সম্পর্কিত 'শরীয়া'র সুস্পষ্ট বিধানের পাশাপাশি আরো কতকগুলো বিধান ছিল, যা তখনকার দিনের শাসকবর্গ কুরআন ও সুন্নাহ্‌র মর্মার্থের নিজস্ব ব্যাখ্যানুযায়ী অর্থাৎ তাঁদের ইজতিহাদ মারফত প্রণয়ন করেছিলেন।

এ ছাড়া খোলাফায়ে রাশেদার আমলে আমরা এমন বহুসংখ্যক প্রশাসনিক ও আইন প্রণয়নমূলক বিধানের সম্মুখীন হই, যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আল-কুরআন অথবা সুন্নাহ্ থেকে লব্ধ নয়, বরং সরকার পরিচালনার দক্ষতা, যোগ্যতা ও জনস্বার্থের প্রয়োজনে সম্পূর্ণরূপে কাণ্ডজ্ঞানের উপর নির্ভর করেই এসব প্রণীত হয়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ হযরত ওমর কর্তৃক পারস্যের আদর্শে

www.pathagar.com

কোষাগার বা দেওয়ান প্রতিষ্ঠার কথা কিংবা সদ্যবিজিত অঞ্চলসমূহে আরবীয় যোদ্ধাদের সম্পত্তি ক্রয় বা অর্জন নিষিদ্ধ ঘোষণা করার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যেহেতু এসব বিধান তখনকার দিনের বৈধ সরকার কর্তৃক জারি হয়েছে, অধিকন্তু এইগুলো 'শরীয়া'র কোন বিধানের গূঢ়ার্থের অথবা বাহ্যার্থেরও বিরোধী ছিল না, সে কারণে সে সময়ের জন্য সেগুলো আইন হিসেবে পরিপূর্ণরূপে বৈধই ছিল। কিন্তু এর মানে এ নয় যে, এগুলো সর্বকালের জন্যই বৈধ থাকবে।

রসূল (সা)-এর সাহাবাদের আদর্শ

আইনের এই নমনীয়তার দাবির বিরুদ্ধে নিম্নলিখিতরূপ একটি আপত্তি উঠতে পারে, 'ইসলামের গূঢ়তম লক্ষ্যের সঙ্গে আমাদের যতটুকু পরিচিত হওয়া সম্ভব, রসূলের মহান সাহাবারা কি তাঁর চাইতে বেশি পরিচিত ছিলেন না? তাহলে কি রাষ্ট্র–পরিচালনার ক্ষেত্রেও তাঁদের দৃষ্টান্ত হুবহু অনুসরণ করা আমাদের কর্তব্য নয়? আল্লাহ্‌র রসূল কি তাঁর সাহাবাদের আচরণের আদর্শে আমাদের আচরণকে গড়ে তোলার জন্য তাকিদ দেন নি।

এই আপত্তিটির একটা খুব শক্তিশালী ভাবাবেগমূলক পশ্চাদ্‌ভূমি আছে; সুতরাং আমাদের আলোচনার এই পর্যায়ে আমি এর জবাব দেবার প্রয়াস পাবো।

এ কথা সত্য যে, মহানবী তাঁর সাহাবাদেরকে আদর্শরূপে গ্রহণ করার আবশ্যকতা সম্পর্কে আমাদের তাকিদ দিয়েছেন; এ তাকিদ শুধু এ কারণে নয় যে, তাঁরা হযরত (সা)–এর সাহচর্যে বহু বছর ব্যয় করেছেন এবং তার ফলে তাঁর চালচলন ও শিক্ষা সম্পর্কে তাঁরা সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল ছিলেন; বরঞ্চ এই কারণেও যে, তাঁদের কারো কারো চরিত্র ও স্বভাব অতোটা উন্নত পর্যায়ে পৌঁছেছিল যার তুলনা নেই। অবশ্য মহান সাহাবাদের অনুরূপ হওয়ার জন্য চেষ্টা করার যে নৈতিক দায়িত্ব আমাদের রয়েছে তার যথার্থ সম্পর্ক হচ্ছে তাঁদের নিঃস্বার্থপরতা, তাঁদের আদর্শবাদ ও আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়ের কাছে তাঁদের অকুণ্ঠ আত্মসমর্পণের সঙ্গে। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে পরবর্তীকালের মানুষ কর্তৃক সাহাবাদের প্রথা–পদ্ধতির অনুকরণের সঙ্গে এই নৈতিক দায়িত্বের কোন সম্পর্ক নেই বা থাকতে পারে না, শুধু উপরোল্লিখিত এই কারণে যে, বহু ক্ষেত্রে এই প্রথা–পদ্ধতি ছিল কাল–সৃষ্ট প্রয়োজন ইসলামে রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার মূলনীতি ও ব্যক্তিগত ইজতিহাদের ফল এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে শুধুমাত্র 'শরীয়া'র বিধানের উপর নির্ভরশীল ছিল না। এ ধরনের অবাধ ইজতিহাদী সিদ্ধান্তের সাহায্য গ্রহণে শাসকের অধিকার সম্পর্কে মহানবীর অনুমতির দৃষ্টান্ত বহু হাদীসেই রয়েছে — কিন্তু তাঁর সাহাবা মুআয ইব্‌নে জাবালের সঙ্গে তাঁর

www.pathagar.com

কথোপকথনের যে ঐতিহাসিক বিবরণ বিদ্যমান, তাতে এ অনুমতি যেমন সুস্পষ্টভাবে রয়েছে তেমন বোধ হয় কোথাও নেই।

ان رسول الله صلعم لما بعثه الى اليمن قال كيف تقضياذا عرض لك قضاء قال: اقضى بكتاب الله قال فان لم تجد فيكتاب قال فبسنة رسول الله قال فان لم تجد فى سنة رسول الله قال اجتهد برای قال فضربرسول الله صلعم على صدره وقال الحمد الذى وفق رسول لله لما يربه رسول الله-

যখন তাঁকে (মুআয ইব্‌নে জাবাল) ইয়েমেনে (গভর্নর হিসেবে) পাঠানো হচ্ছিল, মহানবী তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমার সামনে যেসব ব্যাপার বিচার-নিষ্পত্তির জন্য আসবে সেগুলোর সমাধান তুমি কি করে করবে?' মুআয বলেন, 'আল্লাহ্‌র কিতাব অনুসারে মীমাংসা করব।'

'কিন্তু তুমি যদি আল্লাহ্‌র কিতাব (কোন একটা বিশেষ ব্যাপারে) কিছুই না পাও?'

'তখন আমি আল্লাহ্‌র রসূলের সুন্নাহ অনুযায়ী মীমাংসা করব।'

'কিন্তু যদি আল্লাহ্‌র রসূলের সুন্নাহ্‌তেও এ সম্পর্কে কিছু না থাকে?'

মুআয জবাব দিলেন, 'তখন বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করেই আমি আমার নিজের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করব। রসূলুল্লাহ্‌ তখন তাঁর বুকে থাবা দিলেন এবং বললেন, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আল্লাহ্‌র রসূলের প্রতিনিধিকে রসূলকে সন্তুষ্ট করবার ক্ষমতা দিয়েছেন।'[১]

ইহা কোনক্রমেই কল্পনা করা সম্ভব ছিল না যে, আইন ও প্রশাসন সম্পর্কিত মুআযের এসব মীমাংসা (তখনো যার অস্তিত্ব ছিল না) আল-কুরআন ও সুন্নাহ্‌র নসুসে সুস্পষ্টভাবে বিঘোষিত আইন সংহিতার সঙ্গে একটা স্থায়ী সংযোজন হবে, মহানবীরও লক্ষ্য এ হতে পারে না যে, তিনি মুআযের ভাবী ইজতিহাদী মীমাংসাসমূহকে মুআযের ইহজাগতিক বা আঞ্চলিক আওতার বাইরেও কারো উপর বাধ্যতামূলক করবেন, পরবর্তীকালে মানুষের তো দূরের কথা; কারণ, এরূপ ঘটনা খুবই সম্ভব ছিল যে, (যা সত্য সত্যই প্রায়শ ঘটেছে) কোন এক বিশেষ ব্যাপারে এক সাহাবার মীমাংসা অন্যান্য সাহাবার মীমাংসা থেকে ভিন্ন হয়েছে। মহানবীর বাণীর তাৎপর্য শুধু এই যে, যে সব ব্যাপারে আল-কুরআন ও সুন্নাহ্‌র নসুসে সূত্রবদ্ধ কোন বিধান নেই, সে সমস্ত ক্ষেত্রে তাঁর

১. তিরমিযী ও আবূ দাউদ, মুআয ইবনে জাবালের সনদ অনুযায়ী।

www.pathagar.com

সাহাবার কাণ্ডজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে স্বাধীন-মীমাংসার অধিকার তিনি অনুমোদন করেছেন।

বস্তুত তাঁর কোনো সাহাবাই বিশ্বাস বা আচরণের প্রশ্নে তাঁর নিজস্ব ইজতিহাদকে ধর্মীয় অর্থে কখনো অন্য কারো উপর বাধ্যতামূলক বলে গণ্য করেন নি। তাঁদের হৃদয় ছিল অগাধ বিনয়-নম্রতার আশিসপূত এবং তাঁদের কেউই কখনো নিজের জন্য সর্বকালের বিধানদাতার মর্যাদা দাবির ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেন নি। অথচ পরবর্তীকালের লোকেরা তাঁদের প্রতি ঠিক এই মর্যাদাই আরোপ করেছে। এইসব লোক মহানবীর বিস্ময়কর ঐ বন্ধুদের প্রতি ধর্মীয় এবং নিশ্চিতভাবেই ন্যায়সংগত-ভক্তিবশত মানুষ মাত্রেরই প্রকৃতিতে নিহিত অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে অন্ধ হয়ে পড়েছেন। এই অন্ধতাবশত তাঁরা ভুল করে রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে সাহাবাদের ইজতিহাদের সকল খুঁটিনাটিকে সমাজের উপর সর্বকালের জন্য বাধ্যতামূলক একটি আইন সংক্রান্ত পূর্ব-দৃষ্টান্ত মনে করে থাকেন, যদিও এই দৃষ্টিভঙ্গি শরীয়া বা কাণ্ডজ্ঞান কোনোটির দ্বারাই সমর্থিত নয়।

সাহাবাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা-ভক্তি বিন্দুমাত্র নষ্ট না করেও আমরা নিরাপদে বলতে পারি, ইজতিহাদ মারফত অর্জিত সকল সিদ্ধান্তই — ইজতিহাদকারী যত বড় মহাপুরুষই হোন না কেন, — অনিবার্যভাবে সেই ব্যক্তির পরিবেশ ও জ্ঞানের পরিধি দ্বারা স্থিরীকৃত এবং জ্ঞান, বিশেষ করে তাঁর সামনে সামাজিক বিষয়ের জ্ঞান, মানুষের চরিত্রের মাহাত্ম্যের উপর ততটা নির্ভর করে না, যতটা নির্ভর করে তাঁর সামনে বর্তমান ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার সামগ্রিক যোগফলের উপর। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, আমরা যে ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার উত্তরাধিকারী হয়েছি, — যার কৃতিত্ব মোটেই আমাদের নিজের নয় — তা তেরশ বছর পূর্বে সাহাবাদের সামনে বর্তমান ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার চাইতে পরিমাণে বহুগুণে ব্যাপকতর। বস্তুত ইসলামের সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রস্তাবসমূহের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উপলব্ধির জন্য সাহাবাদের যে সব সম্ভাব্য উপায়-উপকরণ ছিল, কোন কোন দিক দিয়ে আমাদের উপায়-উপকরণ যে সে সবের চেয়েও উৎকৃষ্টতর — এই সত্যটুকু বোঝার জন্য অন্তবর্তী শতাব্দীগুলোতে বিপুলসংখ্যক বৈজ্ঞানিক ধারণার প্রভূত বিকাশ সম্পর্কে চিন্তা করাই যথেষ্ট মনে করি। এর একমাত্র কারণ এই যে, আমরা যে শুধু তাঁদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে পারি তা নয়, বরং ঐ তের শতকের পুঞ্জীভূত ঐতিহাসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সেই অভিজ্ঞতাকেও কাজে লাগাতে পারি, যা তখন পর্যন্ত তাদের কাছে ভাবীকালের দুর্ভেদ্য কুয়াশায় ছিল আচ্ছন্ন।

www.pathagar.com

আমাদের কখনো বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, ইসলামের বাণী হচ্ছে শাশ্বত এবং সে কারণে তা সর্বকালেই মানুষের অনুসন্ধিৎসু বুদ্ধিবৃত্তির কাছে উন্মুক্ত থাকা উচিত। আল-কুরআন ও মহানবীর জীবনাদর্শের আসল শ্রেষ্ঠত্ব এখানেই যে, বিশ্ব সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের পরিধি যতই বর্ধিত হয় আমরা ততই গভীরভাবে ইসলামী বিধানের সারবত্তা উপলব্ধি করতে সমর্থ হই। তাই আল-কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে আমাদের স্বাধীন ইজতিহাদের অধিকার শুধু অনুমতিমূলক নয়, বরং বাধ্যতামূলক এবং সেইসব বিষয়ে বিশেষ করে বাধ্যতামূলক, যেসব বিষয়ে শরীয়া সম্পূর্ণ নীরব অথবা সাধারণ নীতির অতিরিক্ত কিছু আমরা শরীয়তে পাই না। এটা সুস্পষ্ট যে, প্রশাসনিক দক্ষতা অর্জন এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা বিধানের প্রকৃষ্টতম উপায় সম্পর্কে আমাদের সিদ্ধান্তগুলো আমরা যে কালে এবং যে সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিবেশে বাস করছি তারই দ্বারা নিরূপিত এবং এ কারণে ন্যায়ত ইসলামী রাষ্ট্রে আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনের একটা বেশ বড় অংশ সময় থেকে সময়ান্তরে ভিন্ন হতে বাধ্য। অবশ্য এর দ্বারা আল-কুরআন ও সুন্নাহর নসুসে সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত এবং সে কারণে বিশ্বাসীর দৃষ্টিতে অপরিবর্তনীয় — আইনের উপাদানগুলো প্রভাবিত হবে না। এই মৌলিক শর্তকেও এটা ক্ষুণ্ন করতে পারে না যে, এ সব পরিবর্তনশীল শরীয়া-নিরপেক্ষ আইন কিছুতেই দ্ব্যর্থবোধকতা মুক্ত শরীয়ার প্রচলিত আইনসমূহের বিরোধী হতে পারবে না। এ সত্ত্বেও এতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই যে, তাঁদের কালে এবং তাঁদের সময়ের জন্য যা সুষ্ঠু ও যথেষ্ট ছিল, 'খুলাফায়ে রাশেদা'র তেরশ বছর পরে উদ্ভাবিত ইসলামী সংবিধান তা থেকে ন্যায়সংগতভাবেই ভিন্ন হতে পারে।

অবশ্য এক সময়ের রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজন যে প্রায়ই এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী কালের প্রয়োজন থেকে স্বতন্ত্র হতে পারে, তা উপলব্ধি করার জন্য তেরশ বছরের ব্যবধানকে আমাদের দৃষ্টির সামনে প্রত্যক্ষ করে তোলার প্রয়োজনও নেই। এমনকি, স্বল্প কয়েক যুগের ক্ষুদ্র ব্যবধানের মধ্যে খুলাফায়ে রাশেদার খলীফারা নিজেরাই তাঁদের প্রশাসন-ব্যবস্থা তথ্য, আমাদের বর্তমান কালের ভাষায় রাষ্ট্রের শাসন-সংবিধানকে বহু ক্ষেত্রে পরিবর্তন করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ রাষ্ট্র প্রধান নির্বাচনের সমস্যাটিকে নেওয়া যেতে পারে। স্বভাবতই সরকার পরিচালন-ব্যবস্থার নীতি সম্পর্কে সাহাবাদের মধ্যে মতানৈক্য ছিল না, তার কারণ এ ব্যাপারে শরীয়ার ইঙ্গিত অত্যন্ত স্পষ্ট। ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান অবশ্যই নির্বাচিত ব্যক্তি হবেন, এ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ না থাকলেও শরীয়ায় নির্বাচনের কোন বিশেষ পদ্ধতি অবশ্য মেলে না এবং এ কারণে সাহাবারা নির্বাচন পদ্ধতিকে অভ্রান্তভাবেই এমন ব্যাপার মনে করতেন, যা শরীয়ার

www.pathagar.com

ইখ্‌তিয়ার বহির্ভূত এবং সে জন্য যা সমাজের সর্বোত্তম স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে ন্যায়সঙ্গতভাবে পরিবর্তিত হতে পারে। তাই প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর (রা) মহানবীর ইন্তিকালের সময় মদীনায় উপস্থিত মুহাজির ও আনসার দলপতিদের দ্বারা নির্বাচিত হন। হযরত আবূ বকর (রা) মৃত্যু শয্যায় হযরত উমর (রা)-কে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন এবং তাঁর এই মনোনয়ন পরে উম্মা (Community) কর্তৃক সমর্থিত ও স্বীকৃত হয় (এখানে সমর্থন নির্বাচনের সমার্থক)। হযরত উমর (রা) যখন নিজে মৃত্যু শয্যায়, তখন তিনি রসূল (সা)-এর সাহাবাদের মধ্যে ছয়জনের সমবায়ে একটি নির্বাচনী সংস্থা গঠন করেন এবং তাঁদের উপর তাঁদের মধ্য থেকে তাঁর উত্তরাধিকারী নির্বাচনের দায়িত্ব অর্পণ করেন। তাঁরা হযরত ওসমান (রা)-কে নির্বাচিত করেন এবং তিনি উম্মা কর্তৃক উমর (রা)-এর যথার্থ উত্তরাধিকারী বলে স্বীকৃত হন। ওসমান (রা)-এর ইন্তিকালের পর হযরত আলী (রা) জামাত কর্তৃক মসজিদে নববীতে খলীফা বলে ঘোষিত হন এবং পরে উম্মার সংখ্যাগুরু অংশ তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন।

সুতরাং এই চারটি খিলাফতে, যাকে আমরা 'রাশেদা' বা অভ্রান্ত বলে বর্ণনা করে থাকি, তার প্রত্যেকটির আমলেই একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে রাষ্ট্রের সংবিধান স্বতন্ত্র রূপ পরিগ্রহ করেছে। নির্বাচকমন্ডলী গঠন ও নির্বাচন-পদ্ধতির এই প্রশ্নে সাহাবাদের ভিন্ন ভিন্ন পন্থায় এটাই প্রতীয়মান হয় যে, তাঁদের মতে এ ব্যাপারে রাষ্ট্রের 'ইসলামী' চরিত্র সামান্য ক্ষুণ্ন না করেও রাষ্ট্রের সংবিধানকে সময় থেকে সময়ান্তরে বদলানো যেতে পারে।

এছাড়া এ বিশ্বাস ভ্রমাত্মক যে, 'খুলাফয়ে রাশেদার' উদ্যম ও প্রয়াস রাষ্ট্র পরিচালনার কলাকৌশলসহ ইসলামের সকল লক্ষ্যের পূর্ণ রূপায়ণের সমার্থক। যদি তা হত তাহলে ইসলাম শুধু চিরন্তন পুনরাবৃত্তির প্রতি একটা আহবান রূপেই গণ্য হত, কারণ আমাদের পূর্ববর্তিগণের ক্রিয়াকলাপের অনুকরণ ছাড়া আমাদের আর কিছুই করবার থাকত না। আসলে কিন্তু ইসলাম সামাজিক ও আত্মিক ব্যাপারে এবং সে কারণে রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারেও চিরন্তন প্রগতির প্রতিই আহবান।

খুলাফায়ে রাশেদার খিলাফত ছিল ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালন কৌশলের এক পরম গৌরবজনক সূচনা। পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে এটা কখনো অতিক্রান্ত, এমনকি অনুসৃতও হয়নি; কিন্তু এসব সত্ত্বেও এটা শুধু একটি সূচনাই ছিল। আবূ বকর (রা)-এর খলীফা পদে বৃত হওয়ার মুহূর্ত থেকে আলী (রা)-এর মৃত্যু পর্যন্ত, কাঠামোর দিক দিয়ে ইসলামী সাধারণতন্ত্রটি ছিল নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিবর্তনশীল, প্রতিটি বিজয় এবং প্রতিটি নতুন প্রশাসনিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে

www.pathagar.com

সঙ্গে আবয়বিক দিক দিয়ে তা বর্ধিত ও বিকশিত হয়েছে। এক পুরুষের মধ্যেই এটা আরবের প্রান্তদেশ থেকে, উত্তর আফ্রিকা থেকে শুরু করে মধ্য এশিয়ার কেন্দ্রস্থল পর্যন্ত একটা রাজ্যে পরিণত হয়। মহানবীর জীবদ্দশায় যে রাষ্ট্র গঠিত ছিল শুধুমাত্র কৃষিজীবী পশুচারী সম্প্রদায় নিয়ে, যাদের প্রয়োজনগুলো ছিল মামুলি আর সমস্যাগুলো ছিল অপেক্ষাকৃত গতিহীন ও বৈচিত্র্যহীন সে রাষ্ট্রই সহসা অতিশয় জটিল বাইজেন্টাইনীয় ও সাসানীয় সভ্যতার উত্তরাধিকারী হয়ে দাঁড়াল। সরকারের সমস্ত শক্তি যখন সামরিক সংহতি বিধান ও ন্যূনতম প্রশাসনিক যোগ্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য নিয়োজিত করার প্রয়োজন হয়েছিল তখন প্রতিদিনই রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিকর নব নব সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। প্রায়ই মুহূর্তের মধ্যেই সরকারী সিদ্ধান্ত করতে হয়েছে এবং এ কারণে এসব সিদ্ধান্তের অনেকগুলো অনিবার্যভাবেই নিছক পরীক্ষামূলক ছিল। সেই প্রথম বিস্ময়কর পরীক্ষণে থেমে গিয়ে খুলাফায়ে রাশেদার তেরশ বছর পরে হুবহু একই রূপ একটি ইসলামী রাষ্ট্র সংগঠনের চিন্তাধারা সত্যিকার পুণ্যের কাজ হবে না, বরং এটা হবে সাহাবাদের সৃজনধর্মী প্রচেষ্টার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। তাঁরা ছিলেন অগ্রপথিক এবং পথিকৃৎ; আমরা যদি সত্যি সত্যি তাঁদের সমান হতে অথবা তাঁদের ছাড়িয়ে যেতে চাই, তাহলে আমাদেরকে অবশ্য তাঁদের অসম্পূর্ণ কাজ হাতে নিতে হবে এবং অনুরূপ সৃজনধর্মী মনোভাব নিয়ে তা এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কারণ মহানবী (সা) কি বলেন নি —

اصحابى امانة لامتى-

উম্মার প্রতি আমার সাহাবারা আমানত বিশেষ?[২]

২. মুসলিমঃ আবূ বুরদার রেওয়ায়েত অনুযায়ী।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামী রাষ্ট্রের লক্ষ্যসমূহ

ইসলামী রাষ্ট্রের গূঢ়তম লক্ষ্য হচ্ছে মুসলিম ঐক্য ও সহযোগিতার জন্য একটি রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামোর ব্যবস্থা করা।

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفر قوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فا نقذكم منها - كذالك بين الله لكم آيته لعكم تهتدونولتكن منكم امة يدعوان الى الخير و يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفليحون-

'সকলে সম্মিলিতভাবে আল্লাহ্‌কে প্রদত্ত অঙ্গীকারে মজবুত থাক এবং বিচ্ছিন্ন হয়ো না। এবং তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র রহমতের কথা স্মরণ কর, কিভাবে তোমরা যখন শত্রু ছিলে তিনি তোমাদের অন্তরকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন, যাতে তাঁর রহমতে তোমরা পরস্পর ভাই হয়েছিলে এবং কিভাবে, তোমরা যখন একটা অগ্নিকুণ্ডের মুখে পৌঁছে গিয়েছিলে তিনি তোমাদেরকে তা থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। এইভাবে আল্লাহ্ তোমাদের কাছে তাঁর বাণী স্পষ্ট করে তোলেন, যাতে তোমরা পেতে পার পথের নির্দেশ এবং যাতে তোমাদের মধ্য থেকে এমন এক উম্মার আবির্ভাব ঘটতে পারে, যে সুবিচারের জন্য আহবান করে, যা ভাল তা করতে আদেশ দেয় এবং যা মন্দ তা করতে বারণ করে। এবং শুধু এরাই চিরস্থায়ী সুখের অধিকারী হবে।'[১]

কাজেই ইসলামী রাষ্ট্র নিজেই একটা লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নয়, একটা উপায় মাত্র, লক্ষ্য হচ্ছে এমন একটি লোক-সমাজের সৃষ্টি যে সমাজ নিরপেক্ষতা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করবে, 'ভালোর' পক্ষে সমর্থন করবে ও 'মন্দের' বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। কিংবা আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে, এমন একটা লোক-সমাজ সৃষ্টি ইসলামী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য, যে সমাজ নৈতিক ও দৈহিকভাবে আল্লাহ্‌র স্বাভাবিক বিধান ইসলাম অনুযায়ী সম্ভাব্য বৃহত্তমসংখ্যক মানুষের

১. আল-কুরআন ৩ঃ ১০৩-১০৪।

www.pathagar.com

নৈতিক ও দৈহিক জীবন-যাপনের অনুকূল সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি ও সংরক্ষণের জন্য কাজ করে যাবে। এ ধরনের একটা সাফল্যের প্রাক-শর্ত হচ্ছে সমাজের অভ্যন্তরে একটা সুদৃঢ় ভ্রাতৃত্ববোধের বিকাশ। আল-কুরআনের বাক্য ঃ

انما المؤمنون اخوة –

'বিশ্বাসীরা অবশ্যই ভাই-ভাই?'[২] — একথা মহানবী কর্তৃক বহুবার বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

المؤمن للمؤمن كا لبنيان يشد بعضه بعضا- المسلم آخ المسلم لا يظامه ولا يسلمه ومن كان فى حاجة آحيه كان الله فى حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج اللهعنه كربة من كربات يوم القيامة من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة –

'বিশ্বাসীরা একে অন্যের কাছে একটা প্রাসাদ (এর অংশ) স্বরূপ, প্রত্যেক অংশ অন্য অংশগুলিকে মজবুত রাখে।[৩] প্রত্যেক মুসলিমই অপর মুসলিমের ভাই, সে তার উপর যুলুম করবে না বা তার উপর যুলুম হতে দেবে না এবং যদি কেউ প্রয়োজনকালে তার ভ্রাতাকে সাহায্য করে আল্লাহ্ তাকে তার নিজের প্রয়োজনকালে সাহায্য করেন এবং যদি কেউ অন্য এক মুসলমানের বিপদ-দূর করে, আল্লাহ্ কর্মফল দিবসে তার কোন কোন বিপদ দূর করবেন এবং যদি কেউ (অপর এক মুসলমানকে) অপমান থেকে বাঁচায়, আল্লাহ্ কর্মফল দিবসে তাকে অপমান হতে রক্ষা করবেন।'[৪]

এই ভ্রাতৃত্বের ভাবাবেগমূলক ভিত্তি তাহলে কি হতে পারে? গোত্র বা জাতির প্রতি যে আনুগত্য অনৈসলামিক সম্প্রদায়সমূহের সমস্ত রাষ্ট্রনৈতিক দল গঠনের একমাত্র যুক্তির উৎস, নিশ্চয়ই তা সে ভিত্তি হতে পারে না। গোত্র ও জাতির প্রতি আনুগত্যকে খাঁটি বিশ্বাসীর অনুপযুক্ত বলে রসূল (সা) ঘৃণার সঙ্গে নিন্দা করেছেন ঃ

لينتهين اقوام يفتخرون با بائهم الذين ماتوا انماهم ليكونون اهون عل الله من الجعل الذى يدهده الخرء بئنه ان الله قد اهب عنكم عيبة الجاهلية وفخرهابالا باء انماهو مؤمن تقى آو فاجر شقى الناس كلهم بنوادم ودم من تراب –

২. আল-কুরআন ৪ঃ১০।
৩. বুখারী ও মুসলিম ঃ রেওয়ায়েত আবূ মূসা।
৪. বুখারী ও মুসলিম ঃ রেওয়ায়েত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমরের।

www.pathagar.com

'নিশ্চয়ই এমন লোক আছে যারা তাদের মৃত পূর্বপুরুষদেরকে নিয়ে অহংকার করে, কিন্তু আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তারা সেই কালো গোবরে পোকা হতেও নিকৃষ্ট — যে তার নাক দিয়ে গোবরের একটি অংশ ঠেলে ঠেলে গড়িয়ে নিয়ে যায়। দেখ, আল্লাহ্ 'জাহিলিয়া'র আমলের ঔদ্ধত্য এবং তার সঙ্গে পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে অহংকারবোধ তোমাদের মন থেকে মুছে দিয়েছেন। মানুষ হয় আল্লাহ্‌ভীরু বিশ্বাসী, না হয় সে হতভাগ্য পাপী। সমস্ত মানুষই হচ্ছে আদমের সন্তান এবং আদমকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছিল।'[৫]

জাতীয়তা তার সকল রূপ এবং আবরণেই, সকল মানুষ সমান, ইসলামের এই মূলনীতির বিপরীত। এইজন্য জাতীয়তাকে মুসলিম ঐক্যের সম্ভাব্য ভিত্তিরূপে একেবারেই বর্জন করতে হবে। আল-কুরআন এবং সুন্নাহ্‌র শিক্ষানুযায়ী সে ঐক্য হওয়া চাই আদর্শিক প্রকৃতির যা জাতি ও জন্মের সমস্ত বিবেচনাকে অতিক্রম করে যায়; সে ভ্রাতৃত্ব এমন সব লোকের ভ্রাতৃত্ব যারা শুধু একই বিশ্বাস এবং একই নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা ঐক্যবদ্ধ, অন্য কিছুর দ্বারা নয়। ইসলামের শিক্ষানুসারে শুধু আদর্শের এমন ঐক্যই মানুষের সকল দল গঠনের ন্যায়সঙ্গত ভিত্তি হতে পারে। পক্ষান্তরে নিজের জাতির বা দেশের বাস্তব অথবা কাল্পনিক স্বার্থকে নৈতিক বিচার-বিবেচনার ঊর্ধ্বে স্থাপন করাকে রসূল কঠোরতম ভাষায় নিন্দা করেছেন ঃ

ليس منا من دعا الى عصبية وليس منا من قاتل عليعصبية وليس منا من مات على عصبية -

'গোত্রগত স্বার্থের কথা যে ঘোষণা করে, সে আমার দলভুক্ত নয়; গোত্রগত স্বার্থের জন্য যে লড়াই করে, সে আমার দলভুক্ত নয়; গোত্রের স্বার্থরক্ষা করতে গিয়ে যে মারা যায়, সে আমার দলভুক্ত নয়।'[৬]

'আসাবিয়া' বা গোত্রপ্রেম, যা মানুষকে সুস্পষ্টভাবে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়, জনৈক সাহাবা তাঁর অর্থ ব্যাখ্যা করতে বললে রসূল (সা) বলেন ঃ

ان تعين قومكم على الظلم-

'তোমার নিজের গোত্রকে অন্যায় কাজে তোমার সাহায্য করা।'[৭]

অন্য একবার তিনি আরও পরিষ্কার করে বলেন যে, নিজের সমাজের প্রতি

৫. তিরমিযী ও আবূ দাউদ ঃ রেওয়ায়েত আবূ হুরায়রা।
৬. আবূ দাউদ ঃ রেওয়ায়েত ইবনে মুতীন।
৭. আবূ দাউদ ঃ রেওয়ায়েত ওয়াসিলা ইবনে আল-আসকা।

www.pathagar.com

ভালবাসা মাত্রকেই 'গোত্রপ্রেম' বলা যায় না, যদি না তা অন্য দলের প্রতি অন্যায় আচরণের কারণ হয়।'[৮] পক্ষান্তরে ঃ

قال رسول الله صلعم انصراخاك ظالما او مظلوما فقال رجل يارسول الله انصر مظاو ما فكيف انصر الظالما- قال تمنعه عن الظام قذ لك نصرك ايه -

রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেনঃ 'তোমার ভ্রাতাকে সাহায্য কর। সে অন্যায়াচারী হলেও কিংবা তার উপর অন্যায় করা হলেও।' এতে এক ব্যক্তি বলে উঠল, 'হে আল্লাহ্র রসূল! তার উপর যদি অন্যায় করা হয়, তাকে আমি সাহায্য করতে পারি। কিন্তু অন্যায়কারীকে আমি কি করে সাহায্য করতে পারি?' রসূল জবাব দিলেন ঃ 'তার অন্যায় কার্য থেকে তুমি অবশ্যই তাকে নিবৃত্ত করবে এবং এটাই হবে তার প্রতি তোমার সাহায্য।'[৯]

তাই অন্যায়াচরণের প্রতিরোধ ও পৃথিবীতে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ইসলামের সামাজিক শিক্ষার চূড়ান্ত লক্ষ্য।

كنتم خير امة اخرجت للناس تامرون بالمروف و تنهونعن المنكر وتؤمنون بالله-

"তোমরা হচ্ছ মানব জাতির জন্য প্রেরিত সর্বোত্তম উম্মত — (কারণ) তোমরা ভালোর তাকিদ দাও এবং মন্দকে বাধা দাও এবং তোমরা আল্লাহ্তে বিশ্বাসী।"[১০]

'ভালো'র এ তাকিদ এবং 'মন্দ'র এ বারণের উপরই মুসলিম কওম ও মুসলিম ভ্রাতৃত্বের নৈতিক মূল্য নির্ভর করে; মুসলিম ও অমুসলিমের প্রতি একই ন্যায়বিচারের এই আদর্শের উপরই ইসলামী রাষ্ট্রের ধারণা (যে রাষ্ট্র উক্ত আদর্শেরই একটা রাষ্ট্রনৈতিক উপায়মাত্র) নির্ভরশীল।

ন্যায়বিচার বলবৎ করার জন্য ইসলামের আইনকে দেশের আইনরূপে জারি করা, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলোকে এমনভাবে বিন্যস্ত করা, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তিত্বের বিকাশের পথে সে বাধা পায় যথাসম্ভব কম এবং আনুকূল্য পায় যথাসম্ভব বেশি; শুধু বিশ্বাসের ক্ষেত্রেই নয়, বরং জীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও যাতে সকল মুসলিম নর-নারী ইসলামের নৈতিক উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করতে পারে তার সুযোগ দেওয়া, সকল অমুসলিম নাগরিকের পূর্ণ দৈহিক নিরাপত্তা বিধান ও তৎসহ তাদের পূর্ণ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ও সামাজিক অগ্রগতির সুযোগ দান, বহিঃশত্রুর আক্রমণ ও আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা

৮. আহমদ ইবনে হাম্বল এবং ইবনে মাজা ঃ রেওয়ায়াতে উবাদা ইবনে কসীর।
৯. বুখারী ও মুসলিম ঃ রেওয়ায়েত আনাস।
১০. আল-কুরআন ৩ ঃ ১১০।

www.pathagar.com

হতে দেশকে রক্ষা করা এবং সারা জগতে ইসলামের শিক্ষার প্রচার করা — শুধুমাত্র এই মৌলিক নীতিগুলোতেই ইসলামী রাষ্ট্রের ধারণা, তাৎপর্য ও যৌক্তিকতা নিহিত রয়েছে। যদি কোন রাষ্ট্র এই নীতিগুলোকে বাস্তবে রূপায়িত করে, তবে সে রাষ্ট্রকে যথার্থই 'পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র খিলাফত' বলে বর্ণনা করা যেতে পারে — ন্যূনপক্ষে পৃথিবীর সেই অংশে, যা উক্ত রাষ্ট্রের বাস্তব ইখতিয়ারভুক্ত।

পথনির্দেশক মূলনীতি

শরীয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামী রাষ্ট্রের বৈধতা অর্থাৎ এ রাষ্ট্র কর্তৃক মুসলিমের আনুগত্য ও বশ্যতার ধর্মীয় দাবি আল-কুরআনের নিম্নোক্ত মৌলিক নির্দেশের উপর নির্ভর করে ঃ

يا آيها الذين امنوا اطيوا الله و الطيوا الرسول واو ليالامر منكم-

'হে বিশ্বাসিগণ! আল্লাহ্‌কে মানো এবং আল্লাহ্‌র রসূলকে ও তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বে আছে তাদেরকে মানো।'[১১]

এই সংক্ষিপ্ত নির্দেশে আল-কুরআন ইসলামী রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নীতি প্রতিষ্ঠিত করেছে।

প্রথম ঃ

এ ধরনের রাষ্ট্রের সর্বপ্রথম কর্তব্য হচ্ছে এর ইখতিয়ারভুক্ত অঞ্চলসমূহে শরীয়ার বিধানসমূহ কার্যকরী করা। এই বাধ্যবাধকতার উপর নিম্নোক্ত আয়াতে আরো জোর দেওয়া হয়েছে ঃ

ومن لم يحكم بما انزل الله فا ولئك هم الفاسقون-

'আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তার সাহায্যে যারা বিচার নিষ্পত্তি করে না, তারা নিশ্চয়ই ফাসিক বা দুষ্কৃতিকারী।'[১২]

সুতরাং কোন রাষ্ট্রকেই প্রকৃতপক্ষে ইসলামী রাষ্ট্র বলা যায় না যদি না, সে রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে এই মর্মে কোন বিধান থাকে যে, জনসাধারণ সম্পর্কিত শরীয়ার বিধানসমূহই হবে সকল প্রকার রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়নের অলংঘ্য ভিত্তি। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রাষ্ট্রের ইখতিয়ারকে জনসাধারণ সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহে এভাবে সীমিত করার মানে এ নয় যে, শরীয়ার পরিসরকেও কখনো

১১. আল-কুরআন- ৪ ঃ ৫৯।
১২. আল-কুরআন, ৫ ঃ ৪৭।

www.pathagar.com

অনুরূপভাবে সীমিত করা যেতে পারে; কারণ, শরীয়ার সম্পর্ক সমগ্র মানব জীবনের সঙ্গে, মানুষের সামাজিক এবং ব্যক্তিগত উভয়বিধ জীবনই শরীয়ার ইখতিয়ারভুক্ত। এ সত্য সম্পর্কে আমাদের অন্ধ হওয়া উচিত নয় যে, রাষ্ট্র যেহেতু একটা সামাজিক সংস্থা, সে কারণে রাষ্ট্রের একমাত্র সম্পর্ক হচ্ছে মানব জীবনের সামাজিক দিকের সঙ্গে এবং এজন্যই শরীয়ার কাছ থেকে এই সামাজিক দিক সম্পর্কিত একটা আইন ব্যবস্থা ছাড়া রাষ্ট্র আর কিছু চায় না।[১৩]

দ্বিতীয় ঃ

যদিও ইসলামী রাষ্ট্রের কাঠামো ও কর্মধারায় এ ধরনের একটি সংহিতা সর্বকালেই বুনিয়াদী জিনিস বলে অবশ্যই গণ্য হবে তবুও এর প্রকৃতিই এমন যে শাসনকার্যের উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হতে পারে এমন সকল আইন এ সংহিতা সরবরাহ করতে অক্ষম। কাজেই পূর্বে যেমন বলা হয়েছে, আমাদেরকে সামাজিক ব্যাপারসমূহের সঙ্গে সম্পর্কিত শরীয়ার শর্তসমূহের পূর্ণতা সম্পাদন করতে হবে আমাদের নিজেদের তৈরি জাগতিক ও সংশোধনযোগ্য আইনের দ্বারা। অবশ্য তা করতে গিয়ে একথা মনে রাখতে হবে যে, আমরা যেন এরূপভাবে আইন প্রণয়ন না করি, যা শরীয়ার কোন আইনের বাহ্যরূপ বা মর্ম কথার বিরোধী হয়। কারণ—

وما كان لمؤ من ولا مؤ منة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم-

'যখনি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল কোন ব্যাপারে ফয়সালা করেছেন, বিশ্বাসী নর কিংবা নারীর কাজ নয় সে ব্যাপারে তার নিজের খেয়াল-খুশী মাফিক অন্য কোন পন্থা অনুসরণ করা।'[১৪] তাই শাসন সংবিধানে এ ধারা সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে যে, জাগতিক ব্যাপার সংক্রান্ত কোন আইন কিংবা প্রশাসনিক নির্দেশ তা আদেশমূলকই হোক অথবা অনুমতিমূলকই হোক, বৈধ হবে না — যদি দেখা যায় তা শরীয়ার কোন শর্ত লংঘন করছে।

তৃতীয় ঃ

আল-কুরআনের নির্দেশ 'আল্লাহ্কে মানো এবং রসূলকে মানো', এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই বলা হয়েছে, 'এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বে আছে তাদেরকে' অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্য থেকে যারা কর্তৃত্বে আছে তাদেরকে মানো। একথার মানে এই যে, মুসলিম জামায়াতের বহির্ভূত কোন ব্যক্তি বা শক্তি যদি মুসলমানদের উপর কোন শাসন ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়, নীতিগতভাবে মুসলমান তা মেনে নিতে বাধ্য নয়; পক্ষান্তরে সঠিকভাবে গঠিত ইসলামী সরকারের প্রতি

১৩. শরয়ী আইন প্রসঙ্গে ৬ষ্ঠ অধ্যায় দেখুন।
১৪. আল-কুরআন, ৩৩ ঃ ৩৬।

www.pathagar.com

আনুগত্য হচ্ছে মুসলমানের ধর্মীয় কর্তব্য। সরকারের প্রতি আনুগত্য নাগরিকত্ব অর্জনের এমন একটা নীতি যা সকল সভ্য সম্প্রদায়ই মৌলিক বলে স্বীকার করে থাকে। কিন্তু বিশেষ লক্ষণীয় এই যে, ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থার পটভূমিকায় এই কর্তব্য ততক্ষণই কর্তব্য থাকে, যতক্ষণ না সরকার শরীয়া কর্তৃক নিষিদ্ধ কর্মকে আইনসঙ্গত করে কিংবা শরীয়া কর্তৃক আদিষ্ট কর্মকে নিষিদ্ধ করে। অনুরূপ বিরূপ অবস্থায় রসূলের সুস্পষ্ট ঘোষণা মুতাবিক সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে সমাজ আর বাধ্য থাকে না।

السمع والطاعة على المرء المسلم فيما احب وكره مالميامر بمعصية فاذا آمر بمعصية فلا سمع ولاطاعة-

'নির্দেশটি সে পছন্দ করুক বা না করুক, যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে কোন পাপ কর্ম করতে আদেশ দেওয়া না হচ্ছে, ততক্ষণ তা শ্রবণ করা ও পালন করা মুসলমানের উপর বাধ্যতামূলক। কিন্তু যদি তাকে পাপ কর্মের নির্দেশ দান করা হয়, তা শ্রবণ করা বা পালন করার কথাই ওঠে না।'[১৫]

অন্য কথায়, 'তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বে আছে' তাঁদের প্রতি সমাজের আনুগত্য এই শর্তসাপেক্ষ যে, তাঁরা আল্লাহ্‌র এবং তাঁর রসূলের অনুগত হয়ে কাজ করবেন। এই নীতি থেকে বোঝা যাচ্ছে, সরকারের কার্যকলাপের তত্ত্বাবধান করতে, এর ভাল কার্য সমর্থন করতে এবং যখনই সরকার সদাচরণের পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তখনই সে সমর্থন প্রত্যাহার করতে সমাজ বাধ্য। সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্রের একটা অত্যন্ত অপরিহার্য প্রাক-প্রয়োজন হচ্ছে, জনসাধারণের সম্মতিসাপেক্ষ গভর্নমেন্ট বা সরকার।

চতুর্থ ঃ

'জনসাধারণের সম্মতি'র এই তত্ত্বে পূর্বাহ্নেই স্বীকার করে নেওয়া হয় যে, সরকারমাত্রই জনসাধারণের স্বাধীন ইচ্ছার ভিত্তিতে জন্মলাভ করে থাকে এবং তা পরিপূর্ণভাবে এই ইচ্ছারই প্রতিনিধিত্বমূলক। এটাও আল-কুরআনের ঃ 'তোমাদের মধ্য থেকে যারা কর্তৃত্বে আছে' — এই উক্তিরই আরেকটি দিক। এই উক্তির দ্বারা সমগ্র সমাজকেই বোঝাচ্ছে, সমাজের কোন বিশেষ দল বা শ্রেণীকে নয়। এ থেকে বোঝা যায়, ইসলামী আইন পালন করতে হলে রাষ্ট্রের নেতা অবশ্যই নির্বাচিত হওয়া চাই — এর তাৎপর্য এই যে, নির্বাচন বহির্ভূত যে কোন উপায়ের মাধ্যমে নিহিত কাল্পনিক জন্মগত অধিকারের ভিত্তি যেমন উত্তরাধিকার-ভিত্তিক রাজতন্ত্রের ধারণায় সরকারী ক্ষমতাদখল ক্ষমতাধিকারী ব্যক্তিটি নিজকে মুসলিম বলে দাবি করলেও স্বাভাবিকভাবেই অবৈধ বলে গণ্য

১৫. বুখারী ও মুসলিম, ইবনে উমরের সনদ অনুযায়ী

www.pathagar.com

হয়, যেমন মুসলমানদের পক্ষে অবৈধ হচ্ছে মুসলিম সম্প্রদায় বহির্ভূত কোন শক্তি কর্তৃক তাদের উপর ক্ষমতা বিস্তার।

রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের উৎস

এখানে আমরা রাষ্ট্রীয় দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হই। সে প্রশ্নটি হচ্ছে — ইসলামী রাষ্ট্র যেসব উৎস থেকে তার সার্বভৌমত্ব অর্জন করে বলে ধারণা করা হয়ে থাকে সেগুলো কী? প্রশ্নটি প্রথম দৃষ্টিতে যেরূপ একটা তাত্ত্বিক ব্যাপার বলে প্রতীয়মান হতে পারে, আসলে মোটেই তা নয়।

একথা ঠিক, 'রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের উৎস কী' ব্যক্তি হিসেবে একজন সাধারণ নাগরিক সাধারণত এ সম্পর্কে মাথা ঘামাতে চায় না, যদি রাষ্ট্রের শাসন-প্রণালী ও প্রতিষ্ঠানসমূহ তার ব্যক্তিগত জীবনপদ্ধতি এবং তার অর্থনৈতিক উন্নতির সম্ভাবনাসমূহের আনুকূল্য করে বা অনুকূল বলে মনে হয়। তা সত্ত্বেও কোন ঐতিহাসিকই অস্বীকার করতে পারেন না যে, নাগরিকবর্গ তাদের রাষ্ট্রের প্রতি যে সব নৈতিক মূল্য আরোপ করে, পরিণামে সে সব রাষ্ট্রের আধ্যাত্মিক কর্তৃত্ব বজায় রাখার পক্ষে অপরিহার্য — এবং এ কারণে, চূড়ান্ত পর্যায়ে সামাজিক শৃঙ্খলা শব্দটির ব্যাপকতম অর্থে উক্ত শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যই এগুলো অপরিহার্য। কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বাহ্যরূপই — হোক না তা সর্বশ্রেষ্ঠ — নিজের গুণে তার উদ্দেশ্য হাসিল করতে সক্ষম নয়। চূড়ান্ত পর্যায়ে এসবের হিতকারিতা নির্ভর করে এসবের আধ্যাত্মিক উপাদানসমূহের উপর এবং এই উপাদানগুলো ত্রুটিপূর্ণ হলে সে সবের পরিণাম সমাজের জন্য মারাত্মক হতে পারে। কাজেই এটা খুবই সম্ভব যে, বহু শতাব্দী ধরে মুসলিম সমাজে সামাজিক শৃঙ্খলা ও নাগরিক বোধের যে অভাব বিদ্যমান রয়েছে, তার জন্য প্রধানত দায়ী রাষ্ট্রমাত্রই স্বভাবত যে কর্তৃত্বের অধিকারী তার ভিত্তি সম্পর্কে ধারণার বিভ্রান্তি (যে বিভ্রান্তি আবার উপর্যুপরি কতকগুলো দুর্ভাগ্যজনক ঐতিহাসিক ঘটনার ফলেই সৃষ্ট)। এই বিভ্রান্তির মধ্যে মুসলমানেরা যে কেন শত শত বছর ধরে যালিম শাসকবর্গের যুলুম ও শোষণের নিকট নেহায়েত বশংবদের মত আত্মসমর্পণ করে এসেছে তার ব্যাখ্যা মিলবে।

বলা বাহুল্য, আমাদের কালের রাজনৈতিক আবহাওয়া অন্যায়ের কাছে এহেন ভীরু আত্মসমর্পণ আর অনুমোদন করে না। পাশ্চাত্য রাষ্ট্র-তত্ত্বসমূহের প্রভাব, শিক্ষিত মুসলমানেরা ক্রমেই অধিকতর সংখ্যায় এ মত প্রচার করতে শুরু করেছেন যে, চূড়ান্ত সার্বভৌম শক্তির অধিকারী হচ্ছে 'জনসাধারণ', সমস্ত রাষ্ট্রীয় সংস্থার গঠনে এবং সাময়িক আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কেবল এই

www.pathagar.com

'জনসাধারণের' ইচ্ছাই হবে চূড়ান্ত। এমনকি যেসব আধুনিক মুসলিম নীতির দিক দিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের ভাব-কল্পনাকে স্বীকার করে নেন, তাঁদের মধ্যেও উল্লেখযোগ্যসংখ্যক এমন ব্যক্তি রয়েছেন, যাঁরা রসূলের একটি উক্তির ভিত্তিতে 'সমগ্র জাতির ঐক্যবদ্ধ ইচ্ছাই' (ইজমা) সার্বভৌম শক্তি — এই দাবি করে থাকেন। রসূলুল্লাহ্‌র উক্তিটি এই ঃ

ان الله لا يجمع امتى على الضلالة-

'আল্লাহ্ কখনো আমার উম্মতকে কোন ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে বা লক্ষ্যে একমত হতে দেবেন না।'[১৬]

এই হাদীস থেকে বহু মুসলমান এই সিদ্ধান্ত করে থাকেন যে, সমাজ অন্ততপক্ষে সমাজের সংখ্যাগুরু অংশ যে ব্যাপারেই একমত হয়, তা সকল অবস্থায় সঠিক পন্থা।

কিন্তু এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণভাবে অযৌক্তিক। রসূলের উপরোক্ত উক্তি নেতিবাচক, ইতিবাচক নয়। তিনি যা বলেছেন, সম্পূর্ণভাবে তা-ই বোঝাতে চেয়েছেন অর্থাৎ সকল মুসলমান কখনও ভ্রান্ত পথ অনুসরণ করবে না এবং তাদের মধ্যে সর্বকালেই এমন সব ব্যক্তি বা দল থাকবেই যারা ভুল সিদ্ধান্তকারীদের থেকে ভিন্নমত পোষণ করবে এবং সঠিক পন্থা অনুসরণের উপর জোর দেবে।

অতএব, ইসলামের রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে যখনই আমরা 'জনসাধারণের ইচ্ছা'র কথা বলি, তখনই আমাদের পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত; অর্থাৎ আমাদের অতীতের শত শত বছরের অনৈসলামিক স্বৈরতন্ত্রের স্থলে সমগ্র সমাজের অবাধ সার্বভৌমত্বে একই রূপ অনৈসলামিক ধারণাকে আমরা যেন গ্রহণ না করি।

যেহেতু, যে কোন ইসলামী রাষ্ট্রের বৈধতা একটা বিশেষ আদর্শ সম্পর্কে জনসাধারণের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত মতৈক্যের উপর নির্ভর করে এবং যেহেতু তা রাষ্ট্র কী পদ্ধতিতে শাসিত হবে, সে সম্পর্কে তাদের সম্মতির উপরও নির্ভরশীল, তাই যে কেউ কথা বলতে চাইতে পারে যে, 'জনসাধারণই হচ্ছে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।' পক্ষান্তরে যেহেতু কোন সচেতন ইসলামী সমাজে বিশেষ কোন শাসনপদ্ধতি এবং সামাজিক-রাষ্ট্রীয় সহ-সামাজিক-রাষ্ট্রীয় সহযোগিতার বিশেষ কোন পরিকল্পনা সম্পর্কে জনসাধারণের সম্মতি হচ্ছে ইসলামকে একটা ঐশী ব্যবস্থা হিসেবে তাদের মেনে নেওয়ারই ফল; সেজন্য নিজস্ব অধিকাররূপে তাদের সার্বভৌমত্বের অধিকারী হওয়ার কথাই ওঠে না। আল-কুরআন বলে ঃ

১৬. আত্-তিরমিযী, আবদুল্লাহ্ ইবনে উমরের সনদ অনুযায়ী।

www.pathagar.com

قل اللهم ملك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير -

'বল, হে সার্বভৌমত্বের মালিক আল্লাহ্। যাকে পছন্দ কর, সার্বভৌমত্ব দান কর। যার নিকট থেকে ইচ্ছা সার্বভৌমত্ব কেড়ে নাও। তুমি যাকে পছন্দ কর, মহিমান্বিত কর এবং যাকে ইচ্ছা হেয় কর। তোমার হস্তে সমস্ত কল্যাণ, কারণ সমস্ত কিছুর উপর তোমার ক্ষমতা।'[১৭]

সুতরাং সমস্ত সার্বভৌমত্বের উৎস হচ্ছে শরীয়ার নির্দেশাবলীতে প্রকাশিত আল্লাহ্র ইচ্ছা। মুসলিম সমাজের ক্ষমতা পরোক্ষ ধরনের এবং মুসলিম সমাজ সে ক্ষমতা যেন আল্লাহ্র আমানত হিসেবেই ভোগ করে। কাজেই ইসলামী রাষ্ট্র — যার অস্তিত্ব জনসাধারণের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে এবং যা জনসাধারণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে, সেই রাষ্ট্র চূড়ান্ত পর্যায়ে তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্র কাছ থেকেই পায়। পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে শরীয়ার যে সব শর্তের কথা আমি আলোচনা করেছি, এই সার্বভৌমত্ব যদি তার সাথে সুসামঞ্জস্য হয়, তাহলে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উক্তি অনুসারে ইহা রাষ্ট্রের নাগরিকদের আনুগত্যের দাবি করতে পারে ঃ

من اطاعنى فقد اطاع الله ومن عصانى فقد عصى لله ومن يطع الامير فقد اطاعنى ومن يعصى الامير فقد عصانى-

'আমাকে যে মানে সে আল্লাহ্কে মানে এবং আমাকে যে অমান্য করে, সে আল্লাহ্কে অমান্য করে। আমীরকে (রাষ্ট্রপ্রধানকে) যে মেনে চলে, সে আমাকে মানে এবং আমীরকে যে অমান্য করে সে আমাকে অমান্য করে।'[১৮] তাই, সমাজের সংখ্যাগুরু অংশ যখন কোন বিশেষ নেতার উপর সরকার পরিচালনের দায়িত্ব অর্পণ করে, তখন প্রত্যেক মুসলিম নাগরিকই যে উক্ত সিদ্ধান্ত মেনে নিতে নৈতিকতার দিক দিয়ে বাধ্য, একথা অবশ্যই প্রত্যেক নাগরিককে স্বীকার করেত হবে — যদিও তা তার ব্যক্তিগত পছন্দের বিরুদ্ধে যায়।

রাষ্ট্রপ্রধান

যেহেতু বংশভিত্তিক বা সাংস্কৃতিক কোন গোষ্ঠী বা গোত্রসত্তার আত্মনিয়ন্ত্রণ ইসলামী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য নয়, বরং মানুষের বিষয়-কর্মে একটা ব্যবহারিক ব্যবস্থা হিসাবে ইসলামী বিধানের প্রতিষ্ঠাই এর কাম্য, তাই একথা

১৭. আল-কুরআন, ৩ ঃ ২৬।
১৮. বুখারী ও মুসলিম ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর সনদ অনুসারে।

www.pathagar.com

বলা বাহুল্য যে, সেই ব্যক্তির উপরই — যিনি আইনের ঐশী উৎসে বিশ্বাসী, অন্য কথায়, একজন মুসলমানের উপরই রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্বভার অর্পিত হতে পারে। ইসলামী রাষ্ট্র ছাড়া যেমন পূর্ণ ইসলামী জীবন সম্ভব নয়, তেমনি কোন রাষ্ট্রকেই সত্যিকার ইসলামী রাষ্ট্র বলা যায় না, যদি না তা এমন জাতি কর্তৃক পরিচালিত হয়, যা ইসলামের ঐশী আইনের কাছে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আত্মসমর্পণ করতে প্রস্তুত বলে মনে করা যেতে পারে।

যে সব দেশ সম্পূর্ণভাবে বা প্রায় সম্পূর্ণভাবে মুসলমানদের দ্বারা অধ্যুষিত (যেমন সউদী আরব, আফগানিস্তান) যে সব দেশে এই নীতি স্বভাবতই কোন অসুবিধার কারণ হবে না। কিন্তু যে সব মুসলিম দেশে অমুসলিমদের সংখ্যা অনুভবযোগ্য এবং অধিকাংশ মুসলিম দেশই এই শ্রেণীতে পড়ে; সে সব দেশে উক্ত দাবি কিছুটা আশংকার কারণ হতে পারে; কারণ এতে মুসলিম ও অমুসলিম নাগরিকের মধ্যে পার্থক্য করা হতে পারে। আসল কথা এই যে, এই পার্থক্যের আশংকা একেবারেই তত্ত্বগত ব্যাপার এবং সরকার দ্বারা পরিচালন-ব্যবস্থার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই; কারণ যে সব দেশে মুসলমানেরা বিপুল পরিমাণে সংখ্যাগুরু (এবং শুধু এইগুলোকেই যুক্তিসঙ্গতভাবে 'মুসলিম দেশ' বলা যেতে পারে) সে সব দেশে রাষ্ট্রের নেতৃত্ব স্বতঃই মুসলমানদের অধিকারে থাকে। তবু, পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণা এবং সংস্কারের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত আধুনিক রাজনৈতিক চিন্তাধারার পটভূমিকায় ধর্মীয় কারণে তত্ত্বগত পার্থক্যও বহু মুসলমানের কাছে অরুচিকর ঠেকতে পারে; তাদের মধ্যে যে সব অমুসলিম সংখ্যালঘু বাস করছে তাদের কথা না হয় উল্লেখ না-ই করলাম। কাজেই শুরুতেই আমাদেরকে একথা অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হবে যে, মুসলিম এবং অমুসলিমদের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য না করে আল্-কুরআন এবং সুন্নাহ্-পরিকল্পিত ইসলামী রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রসমূহ প্রতিষ্ঠার কথাই উঠতে পারে না। কাজেই এ ব্যাপারে যে কোন দ্বিধা বা দ্ব্যর্থবোধকতা আমাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ অমুসলিম জাতি এবং মুসলিম জাতি নিজে — উভয়ের প্রতিই চূড়ান্ত অসততারই পরিচায়ক হবে।

এর অর্থ এই নয় কিংবা এ হতে পারে না যে, জীবনের সাধারণ মন্ডলগুলোতে আমরা অমুসলিম নাগরিকদের সাথে ভেদমূলক ব্যবহার করবো। পক্ষান্তরে, একজন মুসলিম নাগরিক ন্যায়সঙ্গতভাবে যে স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা দাবি করতে পারে প্রত্যেকটি অমুসলিম নাগরিককেও অবশ্যই তা দিতে হবে; তফাৎ শুধু এই ঃ চরম নেতৃত্ব তাদেরকে দেয়া না হতে পারে। এ সত্যকে অস্বীকার করার উপায় নেই যে, কোন অমুসলিম নাগরিকের ব্যক্তিগত সততা এবং রাষ্ট্রের প্রতি তার আনুগত্য যতই বেশি হোক না কেন, মনস্তাত্ত্বিক কারণে

www.pathagar.com

তার পক্ষে ইসলামের আদর্শিক লক্ষ্যের রূপায়ণের জন্য প্রাণ দিয়ে কাজ করা সম্ভব নয়; কিংবা ন্যায়-নীতির দিক দিয়ে তার কাছে এমন দাবিও করা যায় না।

অন্যদিকে কোন আদর্শিক সংগঠন (তার ভিত্তি ধর্মের উপরেই হোক বা অন্য মতবাদের উপরই হোক) সংগঠনের আদর্শে বিশ্বাসী নয় এমন লোকের উপর তার বিষয়-কর্ম পরিচালনের দায়িত্ব ছেড়ে দিতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এটা কি ধারণা করা যায় যে, সোভিয়েত রাশিয়াতে কোন অ-কম্যুনিস্টকে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পদ দেয়া সম্ভব? — রাষ্ট্রের চূড়ান্ত নেতৃত্বের কথা তো ওঠেই না। স্পষ্টতই এবং ন্যায়তই তা সম্ভব নয়, কারণ যতদিন কম্যুনিজম রাষ্ট্রের আদর্শিক ভিত্তি থেকে যাবে ততদিন রাষ্ট্রের লক্ষ্যের সাথে নিজেদেরকে সম্পূর্ণভাবে যারা একাত্ম মনে করবে সে সব ব্যক্তির উপরই ঐ সব উদ্দেশ্যকে প্রশাসনিক নীতিতে রূপায়ণের জন্য নির্ভর করা যেতে পারে। উক্ত সিদ্ধান্ত এবং তার সঙ্গে 'নস' নির্দেশ —

اطيعوا لله واطيعو الرسول واولى الامر منكم-

'আল্লাহ্‌কে মানো এবং রসূলকে ও তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বে আছে তাদেরকে মানো।' — এ দুটো একত্রে আমাদেরকে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছুতেই বাধ্য করে যে, ইসলামী রাষ্ট্রে যাদের হাতে চূড়ান্ত কর্তৃত্ব থাকবে এবং যারা এর নীতি নির্ধারণের জন্য দায়ী হবে তাদেরকে সর্বাবস্থায়ই মুসলিম হতে হবে; এবং এটা শুধু দেশে তারা সংখ্যাগুরু হওয়ার কারণেই সত্য নহে, সংবিধানের একটি ধারণা বলেও এটা আইনত সত্য। আমরা যদি ইসলামকে আমাদের জীবনের সবচেয়ে প্রভাবশালী উপাদানরূপে গ্রহণ করতে স্থির করি, তা হলে প্রকাশ্যে এটা ঘোষণা করার নৈতিক সাহসও আমাদের অবশ্যই থাকতে হবে যে, যে কৃত্রিম 'উদারনৈতিকতাবাদ' মানুষের ধর্মীয় প্রত্যয়কে কোন গুরুত্বই দেয় না, তার চাহিদার সাথে একমত হয়ে আমরা আমাদের ভবিষ্যতকে বিপন্ন করতে রাযী নই এবং বিপরীত পক্ষে, আমাদের দেশে কেউ জন্মেছে অথবা নাগরিকত্ব অর্জন করেছে এই সম্পূর্ণ আকস্মিক ব্যাপারটির চাইতে মানুষের বিশ্বাস আমাদের কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

কাজেই এটা সুস্পষ্ট যে, ইসলামী রাষ্ট্র প্রধানের অবশ্যই মুসলিম হওয়া চাই। আল-কুরআনে ঘোষিত ঃ

ان أكرمكم عند الله أتقاكم -

www.pathagar.com

'আল্লাহ্‌র কাছে সে-ই মহত্তর যে তোমাদের মধ্যে সবচাইতে সৎকর্মপরায়ণ'[১৯] — এই নীতি অনুসারে শুধুমাত্র যোগ্যতার ভিত্তিতেই তাঁকে বেছে নিতে হবে। এই নির্বাচনের মধ্যে জাতি, বংশ বা প্রাক্তন সামাজিক মর্যাদার কোন বিবেচনাই স্থান পেতে পারে না। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

اسمعوا واطيعوا وان امر عليكم عبد حبشى كان رأسه زبية -

'কথা শোন এবং মানো — যদি তোমাদের আমীর কোঁকড়া চুলবিশিষ্ট হাবশী গোলামও হয়।'[২০]

সম্ভাব্য-আমীর[২১] মুসলমান হবেন এবং 'তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সৎকর্মপরায়ণ হবেন' — যার সুস্পষ্ট মানে, তিনি পরিপক্ক, জ্ঞানী ও চরিত্রে উন্নতর হবেন, — এই দাবি ছাড়া শরীয়া এই পদের উপযুক্ততার জন্য অন্য কোন শর্ত আরোপ করে না অথবা নির্বাচনের বিশেষ কোন পদ্ধতি স্থির করে দেয় না কিংবা নির্বাচকমন্ডলীর পরিসরও সীমাবদ্ধ করে না। কাজেই এ সব খুঁটিনাটি ব্যাপার সমাজকেই তার মহত্তর স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে সময়ের প্রয়োজন অনুযায়ী স্থির করতে হয়। আমীর বা রাষ্ট্রপ্রধানের কার্যকালের মেয়াদ কি হবে সে প্রশ্নেও একই কথা প্রযোজ্য। ইহা ধারণা করা যায় যে, এজন্য নিশ্চিতসংখ্যক কয়েকটি বছর নির্দিষ্ট করা যেতে পরে (সম্ভবত পুনরায় নির্বাচিত হওয়ার অধিকারসহ); বিকল্প হিসাবে — আমীর একটি নির্দিষ্ট বয়স-সীমায় পৌঁছলে পর আমীরের কার্যকাল ফুরিয়ে যাবে এ ব্যবস্থা হতে পারে — অবশ্যই যদি আমীর তাঁর দায়িত্ব ও আনুগত্য যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেন। অথবা তৃতীয় একটি বিকল্প এই হতে পারে যে, আমীর যতদিন বেঁচে থাকবেন আমীরের কার্যকলাপের মেয়াদ হবে ততদিন পর্যন্ত, উপযুক্ত শর্তসাপেক্ষে যে আমীর শুধু তখনি তাঁর কার্যভার ত্যাগ করবেন যখন দেখা যায় যে, তিনি তাঁর দায়িত্ব আনুগত্যের সঙ্গে পালন করছেন না; অথবা শারীরিক অসুস্থতা কিংবা মানসিক দুর্বলতার জন্য তিনি আর তাঁর কর্মদক্ষতা বজায় রাখতে পারছেন না। আমীরের কার্যকালের মেয়াদের ব্যাপারে এই বিপুল স্বাধীনতার মধ্যে আমরা আল্-কুরআন ও সুন্নাহর রাষ্ট্রনৈতিক বিধানে যে বিরাট নমনীয়তা অন্তর্নিহিত রয়েছে তারই আরেকটি দৃষ্টান্ত পাচ্ছি।

---

১৯. আল-কুরআন, ৪৯ ঃ ১২।

২০. বুখারী — হযরত আনাসের সনদ অনুযায়ী।

২১. আমি শুধু সুবিধার খাতিরেই এখানে 'আমীর' পদবীটি (আমীর শব্দটি 'আদেশদাতা' 'দলপতি' কর্তৃত্বাধিকারী প্রভৃতি শব্দ দ্বারা তর্জমা করা যেতে পারে) ব্যবহার করেছি। রাষ্ট্র বা সমাজপতিকে বোঝাতে গিয়ে রসূলুল্লাহ যে দুটো পদবীর কথা সবচাইতে বেশি ব্যবহার করেছেন 'আমীর' শব্দটি তার একটি হলেও (অন্যটি হচ্ছে - ইমাম) শরীয়ার দিক থেকে অন্য কোন পদবী বাদ দিয়ে এ পদবী গ্রহণ করার কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

www.pathagar.com

পরামর্শনীতি

ইতিপূর্বে আমরা বলেছি, আমাদের সামাজিক জীবনের পরিবর্তনশীল সকল প্রয়োজন মিটানোর জন্য খুঁটিনাটি আইন প্রণয়ন থেকে ইচ্ছাকৃতভাবেই শরীয়া বিরত থেকেছে। কাজেই ধারাবাহিক বৈষয়িক আইন প্রণয়নের প্রয়োজন স্বতঃসিদ্ধ। ইসলামী রাষ্ট্রে, শরীয়াতে সম্পূর্ণ অনুল্লিখিত বহুবিধ শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সম্পর্কে যেমন এ জাতীয় আইন প্রণীত হবে তেমনি যে-সব সমস্যার ক্ষেত্রে শরীয়া সাধারণ মৌলিক নীতি দান করলেও খুঁটিনাটি বিধি-বিধানের ব্যবস্থা করেনি সে সব ক্ষেত্রেও এ ধরনের আইন প্রণয়নের প্রয়োজন হবে। উভয় ক্ষেত্রেই ইসলামী আইনের মর্মের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এবং জাতির সর্বোত্তম কল্যাণের স্বার্থে ইজতিহাদ তথা স্বাধীন যুক্তি-বিচার প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক খুঁটিনাটি আইন প্রণয়নের দায়িত্ব সমাজেরই। বলা বাহুল্য যে সব ব্যাপারের সঙ্গে আমাদের সামাজিক জীবনের সম্পর্ক রয়েছে সে সব ক্ষেত্রে কোন আইন বিষয়ক ইজতিহাদী সিদ্ধান্তের দায়িত্বই ব্যক্তি বিশেষের খেয়াল-খুশীর উপর ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে না; এ সব সিদ্ধান্ত সমগ্র সমাজের সুনির্দিষ্ট ইজমা বা মতামতের উপর ভিত্তি করে করতে হবে। অবশ্য এর অর্থ এ নয় যে, বিবেচ্য কোন ব্যাপারে পূর্বতন কোন পন্ডিত বা পন্ডিতগোষ্ঠীর ইজতিহাদী সিদ্ধান্তের সঙ্গে সমাজ একমত হতে পারবে না।

এই বৈষয়িক ও সামাজিক আইন প্রণয়ন কে করবে? স্পষ্টতই গোটা সমাজ এক জায়গায় বসে আইন প্রণয়ন করবে, এটা আশা করা যায় না। এমন কোন ব্যক্তি বা নির্দিষ্টসংখ্যক ব্যক্তি থাকা দরকার যাদের হাতে সমাজ আইন প্রণয়নের দায়িত্ব অর্পণ করতে পারে এবং যাদের সিদ্ধান্ত সকলের উপর বাধ্যতামূলক হবে। তাই প্রশ্ন হচ্ছে, কী ধরনের ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের উপর এ দায়িত্ব অর্পিত হতে পারে?

মনে হয়, খুলাফায়ে রাশেদার দৃষ্টান্তের উপর ভিত্তি করে বহু মুসলমান এই মত পোষণ করেন যে, বৈষয়িক এবং শরীয়ার আওতাবহির্ভূত আইন প্রণয়নের সঙ্গে সম্পর্কিত সকল ক্ষমতা একজন মাত্র ব্যক্তি অর্থাৎ 'আমীরে'র হাতে অর্পিত হওয়া উচিত; কারণ, সমাজ কর্তৃক স্বাধীনভাবে তিনি নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁকে শুধু শাসনক্ষেত্রে নয়, আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও সমাজের প্রতিনিধি বলে গণ্য করা যেতে পারে। অবশ্য বহু মুসলমান আবার ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের ভিত্তিতে মনে করেন যে, একজন মাত্র ব্যক্তির হাতে এমন বিপুল পরিমাণ ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করায় সর্বদাই গুরুতর বিপদের সম্ভাবনা থাকে। কারণ একদিকে ব্যক্তি যতই তীক্ষ্ণ-ধী, সদাচারী এবং সদুদ্দেশ্যবান হোন না কেন, নানা ব্যাপারে তাঁর ব্যক্তিগত প্রবণতার দরুন তিনি সহজেই তাঁর বিচারে ভুল করতে পারেন।

www.pathagar.com

পক্ষান্তরে বহু ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত পরিষদের পরস্পরবিরোধী মতের অস্তিত্বই — এবং এই সব মতের উপর বিতর্ক — প্রত্যেকটি সমস্যার উপর নানা দৃষ্টিকোণ থেকে আলোকসম্পাত করে। এইভাবে আইন প্রণয়নের উপর ব্যক্তিগত প্রবণতা বা ঝোঁককে বলবৎ করার বিপদ সম্পূর্ণ দূরীভূত না হলেও অবশ্যই বহুল পরিমাণে হ্রাস পায়। এটাই শেষ কথা নয়; নিরঙ্কুশ ক্ষমতা, এই ক্ষমতার অধিকারীকে প্রায়ই দুর্নীতিগ্রস্ত করে তোলে এবং সচেতনভাবে বা অজ্ঞাতসারে নিজের স্বার্থে অথবা তার দলীয়দের স্বার্থে ক্ষমতার অপব্যবহারের কুমন্ত্রণা দেয়। এই অভিমত অনুসারে রাষ্ট্রের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা একদল আইন-প্রণেতার উপর অর্পিত হওয়া উচিত, যাঁরা শুধু এই উদ্দেশ্যেই সমাজ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন।

এতে করে দেখা যাচ্ছে যে, একদিকে আমীর কর্তৃক পরিচালিত স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা, অন্যদিকে কাউন্সিল কর্তৃক শাসন (কিংবা পরিষদ, পার্লামেন্ট অথবা যে নামই একে আমরা দেই) এই দুই-এর মধ্যে একটি বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা মুসলমানদের আছে। কিন্তু যখন প্রশ্নটিকে আমরা আরো গভীরভাবে তলিয়ে দেখি তখন আমরা দেখতে পাই এ দুই-এর বিকল্পের মধ্যে একটিকে বেছে নেবার আপাত স্বাধীনতার কোন অস্তিত্বই নেই। কারণ, **امر هم شورى بينهم** — 'তাদের (বিশ্বাসীদের) সামাজিক বিষয়-কর্মাদি **(امر)** নিজেদের মধ্যে আলোচনার দ্বারা সম্পন্ন হওয়া উচিত'[২২] — আল-কুরআনের এই নির্দেশ দ্বারা চূড়ান্তভাবে সমস্যার ফয়সালা করা হয়েছে। এই নস **(نص)** নির্দেশকে রাষ্ট্র পরিচালন ব্যবস্থা সম্পর্কিত সকল ইসলামী চিন্তার মৌলিক এবং কার্যকরী ধারা হিসাবে অবশ্য গ্রহণ করতে হবে। এই নির্দেশটি এতই ব্যাপক যে, রাজনৈতিক জীবনের প্রায় প্রত্যেকটি বিভাগই এর আওতায় পড়ে এবং এটা এতই স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থবোধকতামুক্ত যে, ইচ্ছেমত ব্যাখ্যার কোন চেষ্টাই এর অর্থের পরিবর্তন ঘটাতে পরে না। এই নির্দেশ **امر** শব্দটি দ্বারা সামাজিক ধরনের সকল বিষয় কর্মের প্রতি এবং সে কারণে, ইসলামী রাষ্ট্রে সরকার কি পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত হবে তার প্রতিও ইঙ্গিত করা হচ্ছে। অর্থাৎ সকল সরকারী কর্তৃত্বের মূলে যে নির্বাচনের নীতি রয়েছে **امر** শব্দটি তারই ইঙ্গিত বহন করছে। এ ছাড়া **امرهم شورى بينهم** এই বাক্যটি — যার শাব্দিক অর্থ 'তাদের সামাজিক কাজ হচ্ছে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ' — এর দ্বারা সর্বপ্রকার রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে যে শুধু আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শের ফল বলে গণ্য করা হচ্ছে তাই নয়, বরং আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শের সমার্থকও গণ্য করা হচ্ছে। এর

২২. আল-কুরআন, ৪২ ঃ ৩৮

www.pathagar.com

অর্থ রাষ্ট্রের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সমাজ কর্তৃক বিশেষভাবে উক্ত উদ্দেশ্যে নির্বাচিত একটা পরিষদের হাতে অবশ্য অর্পণ করতে হবে।

নির্বাচনভিত্তিক পরিষদ

প্রসঙ্গ থেকে এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, আল্-কুরআনের বিবেচ্য উপরোক্ত বিধানে "তাদের নিজেদের মধ্যে" এই শব্দ কয়টির দ্বারা গোটা সমাজকে বোঝাচ্ছে। সুতরাং আইন পরিষদ বা মুসলিম ইতিহাসের সকল যুগে সুপরিচিত আরেকটি পরিভাষা ব্যবহার করতে হলে বলতে হয়, **مجلس الشورى** 'মজলিস আশ্-শূরা' অবশ্যই গোটা সমাজের নারী-পুরুষের সত্যিকার প্রতিনিধিত্বমূলক হওয়া চাই। এই ধরনের প্রতিনিধিত্বশীলতা শুধুমাত্র অবাধ এবং সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। কাজেই মজলিসের সদস্যদেরকে অবশ্যই সম্ভাব্য বৃহত্তমসংখ্যক নারী এবং পুরুষের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হতে হবে। নির্বাচকমন্ডলীর পরিসর এবং প্রার্থীদের যোগ্যতার মত ভোটদাতাদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতাও হচ্ছে খুঁটিনাটি ব্যাপার। এসব ব্যাপারে আল্-কুরআন অথবা সুন্নাহর কোন সুস্পষ্ট আইনের ব্যবস্থা নেই; ফলে এগুলো সময়ের চাহিদা অনুযায়ী সমাজের স্বাধীন ইচ্ছের উপরই ছেড়ে দেয়া হয়েছে। কেউ কেউ এ যুক্তিও পেশ করতে পারেন যে, মজলিস প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গোটা সমাজ কর্তৃক নির্বাচিত না হয়েও যথেষ্ট প্রতিনিধিত্বশীল হতে পারে যদি এর সদস্যরা আমীর কর্তৃক সোজাসুজি মনোনীত হন; কারণ, তাঁর পদ ও ক্ষমতা যেহেতু জনসাধারণ কর্তৃক প্রদত্ত, সেজন্য ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, তিনি সমাজের ইচ্ছার মূর্ত প্রতীক। কিন্তু এই অভিমতের পক্ষে মুসলিম ইতিহাস থেকে যে সমর্থনের কথাই তোলা হোক না কেন এর দুর্বলতা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে যদি আমরা মনে রাখি যে, আইন-পরিষদ যে পদ্ধতিতে সৃষ্টি হয় সে পদ্ধতিকে অবশ্যই রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির মধ্যে গণ্য করতে হবে। এবং জনসাধারণের পরামর্শের ভিত্তিতে আমাদের সমস্ত সামাজিক বিষয়-কর্ম সম্পন্ন হওয়া উচিত — এই ঐশী নির্দেশ যদি আমরা গ্রহণ করি তবে আমরা এ সিদ্ধান্তে না এসে পারি না যে, মজলিস গঠনের প্রক্রিয়াটিও অবশ্যই পরামর্শের মাধ্যমেই সম্পাদিত হওয়া উচিত — পরামর্শ শব্দটির ব্যাপকতম ও প্রত্যক্ষতম অর্থে। আমাদের সমাজের মত জটিল সমাজে এ ধরনের পরামর্শের রূপ নির্বাচন ছাড়া কিছু হতে পারে না। কারণ, নির্বাচনের সময়ই প্রতিটি প্রার্থীর গুণাবলী প্রকাশ্যভাবে আলোচিত হয় এবং তদনুসারে ভোট প্রদত্ত হয়। শরীয়ায় নির্বাচন পদ্ধতি — প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ, হস্তান্তরযোগ্য অথবা হস্তান্তরের অযোগ্য

www.pathagar.com

ভোট, আঞ্চলিক অথবা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ইত্যাদি কোনটিরই বিধান নেই এবং এ কারণে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার দায়িত্ব হচ্ছে সমাজের।

অবশ্য সমস্ত সরকারী নিয়োগের ক্ষেত্রে এবং সে কারণে নির্বাচনভিত্তিক নিযুক্তির বেলায়ও রসূলুল্লাহ্ (সা) একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের উপর সুস্পষ্ট তাকিদ দিয়েছেন। তাকিদটি এই যে, নিজের জন্য ক্যানভাস করা নিষিদ্ধ। রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

لاتسئل الا مارة فاذك ان اعطيتها عن مسئلة وكلت اليها -

وان اعطيتها عن غير مسئلة أعنت عليها -

"ক্ষমতার আসন (امارة) চেয়ো না, কারণ চাওয়ার ফলে যদি তা তোমাকে দেওয়া হয়, তোমাকে তোমার নিজ শক্তির উপর একা দাঁড়াতে হবে, অথচ যদি তোমার চাওয়া ছাড়াই ইহা তোমাকে দেওয়া হয়, তুমি তাতে সাহায্যপ্রাপ্ত হবে (আল্লাহ্র তরফ থেকে)।"[২৩] ইসলামের শিক্ষার আলোকে রসূলুল্লাহ্ (সা) সুস্পষ্টভাবে এ কথাই বলতে চেয়েছেন যে, স্বীয় দায়িত্বের যথার্থ উপযোগী হওয়ার জন্য আল্লাহ্র সাহায্য মানুষের জন্য অপরিহার্য। পক্ষান্তরে মানুষের ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও যোগ্যতা যত বেশিই হোক না কেন ঐশী সাহায্য ব্যতিরেকে মানুষ ব্যর্থতা বরণ করতে বাধ্য। এই বক্তব্যটিকে স্পষ্টতর করার জন্য বলা যায় কোন ব্যক্তি যখন কোন প্রশাসনিক পদপ্রার্থী হয়েছে রসূলুল্লাহ্ (সা) এরূপ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই প্রার্থীকে উক্ত পদে নিযুক্ত করতে অস্বীকার করেছেন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, যখন তাঁর জনৈক সাহাবী সরকারী পদের জন্য তাঁর নিকট উমেদার হন, রসূলুল্লাহ্ (সা) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন ঃ

'আল্লাহ্র শপথ, আমরা এ ধরনের কাজে এমন কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করি না, যে উহার প্রার্থী কিংবা এমন ব্যক্তিকেও নয়, যে উহার লোভ করে।'[২৪]

সুতরাং, ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধানে যদি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয় কোন প্রশাসনিক পদে (রাষ্ট্রপ্রধানের পদসহ) নিযুক্তির জন্য অথবা কোন প্রতিনিধিত্বশীল পরিষদে নির্বাচিত হতে ইচ্ছুক কোন ব্যক্তি স্বপক্ষে ক্যানভাস করলে সে ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচন অথবা নিযুক্তির জন্য অযোগ্য বলে ঘোষিত হবে, এটা শরীয়ার মূল লক্ষ্যের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সুসংগতই হবে। এই ধরনের একটি বিধান কার্যকর হলে 'পরামর্শের' মাধ্যমে শাসন-পরিচালনের নীতির প্রতি সমকালীন বহু মুসলিমের যে গুরুতর আপত্তি রয়েছে তা সঙ্গে সঙ্গেই দূরীভূত হয়ে যায়। বর্তমানে যে কোন ব্যক্তি, তার প্রকৃত যোগ্যতা যাই হোক না, অঞ্চল

২৩. বুখারী ও মুসলিম - আবদুর রহমান ইবনে সামুরার সনদ অনুসারে।
২৪. এ, আবূ মূসার সনদ অনুসারে।

www.pathagar.com

বিশেষে তার প্রভাব থাকলে কিংবা সম্পদশালী হলে তার নিজের নির্বাচকমন্ডলীর উপর কিছুটা প্রভাব (persuation) খাটিয়ে আইন পরিষদে নির্বাচিত হতে পারেন; কিন্তু উপরোক্ত বিধান কার্যকরী হলে এ ধরনের স্বমতে আনার যে কোন প্রত্যক্ষ প্রয়াসের অব্যবহিত ফল হবে তার অযোগ্যতা ঘোষণা। অবশ্য পার্টি সংস্থা অথবা দালালদেরকে, যারা প্রার্থীর জন্য জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করবে, নিজের কাজে লাগিয়ে প্রভাবশালী অথচ অপদার্থ প্রার্থীর পক্ষে নিজের স্বপক্ষে ক্যানভাস করার দিকটাকে এড়িয়ে যাওয়া তখনও সম্ভব হবে। তবে প্রার্থী যে নিজে নির্বাচনী বক্তৃতা করতে কিংবা নির্বাচকমন্ডলীকে নিজে সম্বোধন করতে পারবেন না, এতেই ব্যাপারটা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। তার ফল এই যে, সাধারণত নির্বাচকমন্ডলী যাকে সুযোগ্য মনে করেন এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্রদ্ধা করেন শুধু তেমন ব্যক্তিরই সাফল্যের প্রভূত সম্ভাবনা থাকবে।

মতনৈক্য

ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, শুধুমাত্র জনসাধারণের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যাপারাদির মধ্যেই মজলিস আশ-শূরার আইন-প্রণয়নের কাজ সীমাবদ্ধ থাকবে এবং তাও বিশেষ করে ঐ সব ব্যাপারের মধ্যে যা আল্-কুরআন এবং সুন্নাহর সুস্পষ্ট বিধানসমূহের **(نصوص)** আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়নি। যখনই সমাজের স্বার্থে আইন প্রণয়ন প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে তখন বিবেচনাধীন সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কিত পথ নির্দেশক কোন সাধারণ আইন বা বিধানের জন্য মজলিসকে অবশ্য সর্বপ্রথম শরীয়ার আশ্রয় নিতে হবে। এ ধরনের কোন সাধারণ নীতি পাওয়া গেলে প্রতিষ্ঠিত শরয়ী নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আইন প্রণয়নের অধিকার আইন পরিষদের এখতিয়ারভুক্ত থাকবে। কিন্তু প্রায়ই মজলিস এমন সমস্যার সম্মুখীন হবে যে সব ব্যাপারে শরীয়া সম্পূর্ণ নীরব ঃ এই সমস্যাগুলো এমন যে এসব সম্পর্কে খুঁটিনাটি রায় নেই এবং নসুস **(نصوص)**-এ সূত্রবদ্ধ কোন সাধারণ নীতিও নেই। এ সব ক্ষেত্রে কেবলমাত্র ইসলামের লক্ষ্য ও সমাজের কল্যাণকে সামনে রেখে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের দায়িত্ব হচ্ছে মজলিসের।

অবশ্য এ সবের দ্বারা আগেই ধরে নেওয়া হচ্ছে যে, মজলিসের সদস্যরা যে শুধু আল্-কুরআন ও নসুস সম্পর্কে উৎকৃষ্ট কার্যকরী জ্ঞান রাখেন তাই নয় বরং তাঁরা জ্ঞান এবং অন্তরদৃষ্টিরও অধিকারী **(الولو الالباب)** এবং তাঁরা জাতির সমাজতাত্ত্বিক প্রয়োজনগুলো এবং সাধারণভাবে জাগতিক ব্যাপারাদি সম্পর্কে সচেতন। অন্য কথায়, মজলিস আশ-শূরায় নির্বাচিত হওয়ার জন্য শিক্ষা এবং পরিপক্কতা হচ্ছে অপরিহার্য যোগ্যতা।

www.pathagar.com

কিন্তু মজলিসের সদস্যরা এসব যোগ্যতার অধিকারী হলেও কোন বিশেষ সামাজিক পরিস্থিতিকে যে তাঁরা হুবহু একই আলোকে দেখবেন এবং পরিণামে ঐ পরিস্থিতির মুকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করতে গিয়ে তাঁরা যে সম্পূর্ণ একমত হবেন এ সম্ভাবনা খুবই কম। মতের এই বিভিন্নতা নেহায়েতই স্বাভাবিক ব্যাপার। কারণ, মানুষের সমস্ত যুক্তি-বিচারই হচ্ছে একটা অতিশয় মন্ময় প্রক্রিয়া (subjective) এবং তাকে চিন্তকের মেজাজগত ঝোঁক, অভ্যাস, সামাজিক পটভূমিকা এবং অতীত অভিজ্ঞতা থেকে সম্পূর্ণভাবে আলাদা করা কখনও সম্ভব নয়। সংক্ষেপে, আমরা যাকে মানুষের 'ব্যক্তিত্ব' বলে বর্ণনা করে থাকি তাকে গঠন করতে যে সব প্রভাব একত্রে কাজ করে থাকে তা থেকে মানুষের বুদ্ধি-বিচার সম্পূর্ণভাবে মুক্ত রাখা অসম্ভব। যা' হোক, ঐ ধরনের মতবিভিন্নতা ব্যতিরেকে সত্যিকার প্রগতি সম্ভব নয়; কারণ সামাজিক সমস্যাসমূহ ভিন্ন ভিন্ন রূপ গঠিত বুদ্ধিবৃত্তির সংঘাত এবং পরস্পরের উপর তাদের উদ্দীপনামূলক ক্রিয়ার মাধ্যমে ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে ওঠে এবং এইভাবে সমাধানের আয়ত্তের মধ্যে আসে।

রসূলুল্লাহ্‌র মনে এটাই ছিল যখন তিনি বলেন, **اختلاف علماء امتى رحمة** "আমার উম্মতের জ্ঞানী ব্যক্তিদের মতের বিভিন্নতা আল্লাহ্‌র রহমত (এর নিদর্শন)"।[২৫] কাজেই পৃথিবীর সকল দেশের অন্যান্য আইন পরিষদের মতই ইসলামী রাষ্ট্রে মজলিস আশ-শূরার সিদ্ধান্তসমূহ যে ক্বচিতই সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হবে, এই সম্ভাবনায় আমাদের বিব্রত বোধ করা উচিত নয়। আমরা যা ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রত্যাশা করতে পারি তা এই যে, সিদ্ধান্তসমূহ সংখ্যাগুরুর মতের ভিত্তিতে হওয়া উচিত — সাধারণ আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সোজাসুজি সংখ্যাগুরুত্বের নীতি (Simple majority) এবং অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে — যেমন সরকারের অপসারণ দাবি করে আলোচ্য, শাসনতন্ত্র সংশোধন, যুদ্ধ ঘোষণা ইত্যাদি ক্ষেত্রে হয়ত দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগুরুত্বের ভিত্তিই অভিপ্রেত হবে।

আধুনিক পাশ্চাত্যে প্রচলিত তথাকথিত প্রায় সকল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে সব দোষ-ত্রুটি সুস্পষ্ট সেগুলোর বিবেচনা করে সমকালীন কিছু কিছু মুসলমান ইসলমী রাষ্ট্রে আইন প্রণয়ন ক্রিয়াকে কেবলমাত্র ভোট গণনার উপর ছেড়ে দেওয়া পছন্দ করেন না। তাদের যুক্তি এই যে, কোন আইনমূলক ব্যবস্থা বা আইন সংখ্যাগুরুর দ্বারা সমর্থিত হয়েছে শুধুমাত্র এ তথ্যটির স্বাভাবিক তাৎপর্য এ নয় যে, ব্যবস্থাটি 'অভ্রান্ত'; কারণ, সংখ্যাগুরু দল যত বৃহৎ এমন কি সদুদ্দেশ্যশীলই হোক না কেন, মাঝে মাঝে সে ভুল করবে এবং সংখ্যালঘু দল সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও সঠিক পথে থাকবে এ সম্ভাবনা সব সময়ই রয়েছে।

২৫. আস-সুয়ূতি, আল জামি আস্-সাগীর।

www.pathagar.com

এই মতের বাস্তব সত্যতা সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ নেই। মানব-মন চূড়ান্তভাবে ভ্রান্তিপ্রবণ; অধিকন্তু মানুষ সকল সময় সত্য ও ন্যায়ের নির্দেশ অনুসরণ করে না। পৃথিবীর ইতিহাস প্রাজ্ঞতর সংখ্যালঘুর হুঁশিয়ারী সত্ত্বেও নির্বোধ বা স্বার্থপর সংখ্যাগুরুর ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে পরিপূর্ণ। সে যাই হোক, আইন পরিষদের অভ্যন্তরে সংখ্যাগুরুর সিদ্ধান্ত-নীতির বিকল্প যে কী হতে পারে তা খুঁজে বের করা কঠিন। সংখ্যাগুরুর মত সঠিক, না সংখ্যালঘুর মত সঠিক প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তা নির্ণয় করবে কে? কার মত গ্রাহ্য হবে? কেউ কেউ বলতে পারে যে, চূড়ান্ত রায় দানের দায়িত্ব আমীরের উপর অর্পিত হওয়া উচিত। কিন্তু ইসলামী আইনে যার উপর এত বেশি জোর দেয়া হয়েছে কোন ব্যক্তি বিশেষকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দান সেই 'আমরুহুম শূরা বাইনাহুম' নীতির বিরোধী, এ কথা বাদ দিলেও এটা কি একই রূপ সম্ভব নয় যে, আমীরই ভুল করেছেন অথচ সংখ্যাগুরু মতই অভ্রান্ত? সংখ্যাগুরু-নীতির সমালোচকেরা এর জবাব সাধারণত এভাবে দিয়ে থাকেন ঃ 'আমরা যখন 'আমীর' নির্বাচন করতে যাই তখন আমাদের অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যেন আমরা সবচেয়ে জ্ঞানী এবং সবচেয়ে সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের নির্বাচন করি এবং তাঁকে যে তাঁর উৎকৃষ্টতর প্রজ্ঞা এবং সৎকর্মপরায়ণতার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে এ তথ্যই এ নিশ্চয়তা দানের জন্য যথেষ্ট যে তাঁর সিদ্ধান্তসমূহ অভ্রান্ত হবে!' খুবই সত্য। কিন্তু এটাও কি একই রূপ সত্য নয় যে, প্রত্যেকটি প্রার্থীর প্রজ্ঞা এবং সৎকর্মপরায়ণতার ভিত্তিতেই মুসলমানেরা মজলিস আশ-শূরা নির্বাচন করবেন বলে আশা করা হয়? এটা কি 'নিশ্চয়তা হিসাবে যথেষ্ট' নয় যে, এই সব পরিষদ সদস্যের সংখ্যাগুরু অংশের সিদ্ধান্ত সব সময়েই সঠিক হবে? অবশ্যই নয়। উভয় ক্ষেত্রেই, যেমন আমীরের বেলায় তেমনি মজলিসের বেলায়ও, যা 'নিশ্চয়তা হিসাবে যথেষ্ট' তা কখনো পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার সমার্থক হতে পারে না; এবং দুর্ভাগ্যক্রমে এটা মানুষের আয়ত্তাতীত। আমরা সবচেয়ে বড় প্রত্যাশা এই করতে পারি যে, যুক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের সমবায়ে গঠিত কোন পরিষদ যখন কোন সমস্যা আলোচনা করে তখন তাদের সংখ্যাগুরু অংশ চূড়ান্ত পর্যায়ে এমন একটি সিদ্ধান্তে একমত হবে যা সঠিক হওয়ার সকল সম্ভাবনা রয়েছে। এই কারণেই, রসূলুল্লাহ্ (সা) বহুবার মুসলমানদের কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

اتبعوا اسواد الاعظم -

'বৃহত্তর দলের অনুসরণ কর।'[২৬] এবং

২৬. ইব্নে মাজাহ্-আবদুল্লাহ্ ইবনে উমরের সনদ অনুসারে।

www.pathagar.com

'তোমাদের কর্তব্য ঐক্যবদ্ধ জামাত এবং সংখ্যাগুরুর (আল আম্‌র) পাশে দাঁড়ানো।'[২৭]

আসলে মানব-বুদ্ধি যৌথ সিদ্ধান্তের জন্য সংখ্যাগুরু নীতির চেয়ে উৎকৃষ্টতর কোন পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে পারেনি। সংখ্যাগুরু ভুল করতে পারে সন্দেহ নেই; কিন্তু ভুল সংখ্যালঘুও করতে পারে। বিষয়টিকে যে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি না কেন, মানব-মনের ভ্রান্তি প্রবণতার জন্য ভুলভ্রান্তি হচ্ছে মানব জীবনের একটা অবিচ্ছেদ্য উপাদান। সুতরাং পরীক্ষণ ও ভুল-ভ্রান্তি এবং ফলস্বরূপ সংশোধনের মাধ্যমে ছাড়া আমাদের শিক্ষার আর কোন উপায় নেই।

২৭. আহ্‌মদ ইবনে হাম্বল-মুআয ইবনে জবলের সনদ অনুসারে।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

শাসন-বিভাগ ও আইন-বিভাগের সম্পর্ক

পরস্পর নির্ভরশীলতা

মজলিস আশ্-শূরা গঠনের মূলে 'নিজেদের মধ্যে পরামর্শের' যে নীতি রয়েছে স্বভাবতই সেই নীতি অনুসারে আইন প্রণয়নকারীদের মধ্যে আমীরেরও স্থান রয়েছে। কারণ, সমাজ কর্তৃক তিনি যেহেতু রাষ্ট্রপ্রধানরূপে নির্বাচিত সেজন্য সমাজের সঙ্গে সম্পর্কিত সকল ব্যাপারে আমীরকে সমাজের সর্বাগ্রগণ্য প্রতিনিধিরূপে অবশ্যই গণ্য করতে হবে। তা ছাড়াও ইসলামী রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় আমীর সকল কর্মের কেন্দ্রবিন্দু হওয়ার ফলে তিনি মজলিসের শুধু একজন সাধারণ সদস্য হতে পারেন না, তাঁকে নেতাও হতে হবে এবং তার কর্তব্য হবে মজলিসের কাজ-কর্ম পরিচালনা করা এবং ব্যক্তিগতভাবে নিজে অথবা কোন প্রতিনিধি মারফত এর বৈঠকাদিতে সভাপতিত্ব করা। ঐশী বিধানের নিয়ন্ত্রণাধীন রাষ্ট্র সরকারের শাসন ও আইন-ব্যবস্থার মধ্যে কোন মৌলিক বিচ্ছেদ থাকতে পারে না, এ দাবি রাষ্ট্র-বিজ্ঞানতত্ত্বে একটা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ খাস্ ইসলামী অবদান।

পশ্চিমের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে শাসন-ব্যবস্থার ও আইন ব্যবস্থার মধ্যে সুস্পষ্ট বিভাগকে শাসন-বিভাগের ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে একমাত্র কার্যকরী রক্ষাকবচ বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। রাষ্ট্রপরিচালনের এই পাশ্চাত্য নীতির কয়েকটি উপকারিতা আছে; কারণ, পরিষদের প্রতি 'সার্বভৌমত্ব' আরোপ করে এবং এমনিভাবে শাসন বিভাগের দৈনন্দিন কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করার মত ক্ষমতায় পরিষদকে আসীন করে শাসন বিভাগকে সন্দেহাতীতভাবে বাগে রাখা হয় এবং দায়িত্বহীনভাবে শাসন বিভাগের ক্ষমতা ব্যবহারের পথ রোধ করা হয়। অবশ্য, শাসন ও আইন বিভাগের মধ্যে এই সুস্পষ্ট বিভাগের ফলে একইরূপ নিঃসন্দেহে — শাসন ও আইন প্রণয়ন উভয় মাধ্যমে মজলিস আশ্-শূরা যে সব সিদ্ধান্তে উপনীত হয় সেগুলো শুধু পরামর্শমূলক নয় — যা শাসন ক্ষমতার অধিকারীরা নিজেদের ক্ষেত্রে — গোটা সরকারই প্রায়ই (এবং বিশেষ করে জরুরী অবস্থার সময় যখন শাসন বিভাগ কর্তৃক দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রয়োজন)

www.pathagar.com

অত্যন্ত বাধাগ্রস্ত হয় এবং এ কারণে এ ধরনের সরকার স্বৈরতন্ত্রী রাষ্ট্রসমূহের মুকাবিলায় অসুবিধাজনক অবস্থায় থাকে। আমরা জানি পাশ্চাত্য কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার পক্ষে স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থার যতটুকু বিরোধিতা কল্পনা করা যায় ইসলামও স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তেমনি আপোসহীন, কিন্তু অন্যান্য বহু ব্যাপারের মত এ ব্যাপারেও ইসলাম একটা মধ্যপন্থার অনুসরণ করে। কারণ; ইসলাম এই উভয় পদ্ধতির অসুবিধাগুলো বর্জন করে চলে এবং উভয়ের কল্যাণকর দিকগুলো মুসলিম সমাজের জন্য গ্রহণ করে। আমীরের (রাষ্ট্র-প্রধান হিসাবে যার শাসন সংক্রান্ত দায়িত্বের একটা অপরিহার্য অনুসিদ্ধান্ত হচ্ছে, তিনি আইন পরিষদের সভাপতি হবেন) মাধ্যমে সরকারের শাসন ও আইন বিভাগের মধ্যে ঐক্য বিধান করে আমরা সাফল্যের সঙ্গে ক্ষমতার সেই দ্বৈততাকে অতিক্রম করতে পারি যা ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রায়ই শাসন-বিভাগ ও আইন বিভাগকে পরস্পরের বিরুদ্ধে স্থাপন করে এবং সময়ে সময়ে পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থাকে উচ্ছৃঙ্খল, এমন কি অকার্যকর করে তোলে। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রে দক্ষতা ও যোগ্যতার ক্ষেত্রে (যা স্বভাবত 'সমূহবাদী' স্বৈরতন্ত্রী' সরকারসমূহের সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য) এই সুবিধা সরকারের কার্যকলাপের উপর জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণ অধিকার বিসর্জনের বিনিময়ে অর্জিত হয় না। বলতে কি, স্বৈরতন্ত্রের দিকে শাসন বিভাগের সম্ভাব্য যে কোন প্রবণতাকে **امر هم شورى بينهم** এই শর্ত মারফত শুরুতেই প্রতিরোধ করা হয়। কারণ এই শর্তের অর্থ এই যে, সরকারের সমস্ত কাজ-কর্ম শাসনমূলক এবং আইন প্রণয়নমূলক উভয়েই সমাজের বিশ্বস্ত প্রতিনিধিদের মধ্যে অবশ্য অবশ্যই আলোচনার মাধ্যমে সম্পাদিত হওয়া উচিত।

এই পরস্পর নির্ভরশীলতার নীতি যৌক্তিকতার সঙ্গে অনুসরণ করলে আমাদের অবশ্য এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে হয় যে, সংখ্যাগুরুর ভোটের ইচ্ছেমত গ্রহণ বা বর্জন করতে পারে — বরং সেগুলো কার্যকরী করতে শাসন বিভাগ আইনত বাধ্য।

ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ

আমরা জানি, অধুনা পরিষদ বলতে যা বুঝায় তেমন কোন পরিষদ খুলাফায়ে রাশেদার আমলে ছিল না। এ কথা নিশ্চিত, পলিসি সংক্রান্ত সকল গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার ক্ষেত্রে এইসব মহান খলীফা সমাজের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পরামর্শ করতেন, কিন্তু যাঁদের সঙ্গে এভাবে পরামর্শ করা হত তাঁরা সমাজ কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে যথাবিধি 'নির্বাচিত' ছিলেন না এবং খলীফা প্রত্যেক ক্ষেত্রে এসব উপদেশ মেনে চলতেও বাধ্য ছিলেন না। তিনি পরামর্শ চাইতেন, সে

www.pathagar.com

পরামর্শের মূল্য বিচার করতেন এবং তারপর তিনি যা ঠিক মনে করতেন সে অনুসারে নিজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন — কখনও সংখ্যাগুরুর মত মেনে নিয়ে সংখ্যালঘুর মত গ্রহণ করে এবং কখনো কখনো উভয়ের মত অগ্রাহ্য করে। কাজেই কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারেঃ খুলাফায়ে রাশেদা, যাঁরা ছিলেন রসূলুল্লাহ (সা)-এর সবচেয়ে অন্তরঙ্গ সাহাবাদের অন্তর্ভুক্ত তাঁরাই যখন যথাবিধি নির্বাচিত কোন পরিষদের প্রয়োজন বোধ করেন নি কিংবা কোন রকমের পরিষদ থেকে থাকলেও সে পরিষদের পরামর্শ মেনে চলা অপরিহার্য মনে করেন নি, তখন আজকের দিনে আমরা কী করে দাবি করতে পারি যে, (ক) ইসলামী রাষ্ট্রের মজলিস আশ-শূরা সর্বসাধারণ কর্তৃক নির্বাচনের ভিত্তিতে অবশ্যই গঠিত হতে হবে এবং (খ) এ ধরনের মজলিস কর্তৃক প্রণীত আইন শাসনকর্তার উপর সর্বাবস্থায় বাধ্যতামূলক হবে?

এই প্রশ্নের প্রথম অংশটির জবাবদান অপেক্ষাকৃত সহজ। **امرهم شورى بينهم** আল্-কুরআনের এই নীতির দ্বারা আদিষ্ট হয়ে, রাষ্ট্র শাসন ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করার জন্য প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর (রা) যখন একটা পরিষদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন তখন সহজাতভাবে তিনি স্মরণাতীতকালের রীতির দ্বারা অনুমোদিত এবং যা শরীয়া কর্তৃক বর্জিত নয়, এমন একটি সংস্থার দিকে মনোযোগী হন। সে সংস্থাটি হচ্ছে বিভিন্ন গোত্র ও খানদানের সরদারদের মজলিস বা পরিষদ। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে খলীফার এই সিদ্ধান্ত সন্দেহাতীতভাবে নির্ভুল ছিল; কারণ ইসলাম গোত্রের বন্ধন উল্লেখযোগ্যভাবে শিথিল করে দিলেও সে সব সম্পর্ক বা বন্ধন তখনো পরিত্যক্ত হয়নি। সেকালের আরব সমাজ তার গোত্রীয় কাঠামো প্রভূত পরিমাণে সংরক্ষণ করেছিল এবং সে কারণে বিভিন্ন গোত্র ও গোষ্ঠীর সরদারেরা আইনত না হলেও, কার্যত তাদের নিজ নিজ দলের নামে কথা বলা ও কাজ করার ক্ষমতায় ক্ষমতাবান ছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ সামাজিক ব্যাপারে কোরেশ গোত্রের বনূ জোহ্‌র খানদানের সরকার অথবা আনসারী আওস গোত্রের সরদারের অভিমত আর ঐসব গোত্র বা গোষ্ঠীর সকল লোকের মতামত প্রায় সম্পূর্ণ অনুরূপ ছিল। খলীফা নির্বাচনের উপর জোর দিলে সুনিশ্চিতভাবে ঐসব সরদারকেই (যাঁদের অধিকাংশই ছিল মহানবীর সহচর) সমাজ তার প্রতিনিধিরূপে ঘোষণা করত। সুতরাং নির্বাচনের কোন প্রয়োজন ছিল না। খলীফার একমাত্র করণীয় ছিল শ্রেষ্ঠ সাহাবাগণ ও গোষ্ঠী সরদারবৃন্দকে আহবান করা এবং এই ছিল তাঁর মজলিস আশ্-শূরা। তৎকালীন অবস্থায়, এটা সমাজের যতটুকু প্রতিনিধিত্বশীল হওয়া সম্ভব ছিল মজলিস আশ্-শূরা ততটুকুই প্রতিনিধিত্বশীল ছিল। মুসলিম সমাজের এই কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য

www.pathagar.com

খুলাফায়ে রাশেদার চার খলীফার আমলে কার্যত অপরিবর্তিতই থেকে যায় এবং তার ফলে তাদের কেউই কাউন্সিল বা পরিষদ গঠনের পদ্ধতি পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন বোধ করেন নি।

যাই হোক, আধুনিক মুসলিম সমাজ (প্রায় সকল সভ্য সমাজের মতই) গোষ্ঠী বা গোত্রভিত্তিক জীবন পদ্ধতি বহু পূর্বেই অতিক্রম করে এসেছে এবং সে কারণে গোত্রীয় বা গোষ্ঠী-নেতৃত্ব তার পূর্বকার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে। ফলে জনসাধারণের মতামত গ্রহণ ব্যতিরেকে (Popular vote) সমাজের মতামত নির্ণয়ের অন্য কোন উপায় এখন আর আমাদের নেই। অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারাদির ক্ষেত্রে এই ভোট রেফারেণ্ডাম বা সমগ্র সমাজের মতামত আহবানের ভোট হতে পারে। যে সব ব্যাপারে দৈনন্দিন আইন প্রণয়নের প্রয়োজন হয় সে সব ব্যাপারে নির্বাচনের চেয়ে উৎকৃষ্টতর পদ্ধতি আজও কেউ আবিষ্কার করেন নি। এটা এতই সুস্পষ্ট যে, এ ব্যাপারে কোন আলোচনাই আমি করতাম না, যদি না দেখতে পেতাম বহু মুসলিম আমাদের বর্তমান সমাজ ও ইসলামের প্রাথমিক যুগে যে সমাজ বিদ্যমান ছিল তার কাঠামোগত পার্থক্য (অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী পার্থক্য) এখনও বুঝতে পারেন নি। আমাদের মত অবস্থা খুলাফায়ে রাশেদার খলীফাগণের হলে তাঁরা তেরশ বছর পূর্বে যে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন নিশ্চয়ই তাঁর চেয়ে বহুল পরিমাণে ভিন্ন সিদ্ধান্তে পৌঁছুতেন। অন্য কথায়, জনসাধারণের ভোটের মাধ্যমে তাঁরা তাঁদের মজলিসের নির্বাচন করতেন।

মজলিস কী পদ্ধতিতে গঠিত হবে, শুধু যে এ প্রশ্নেই উক্ত সিদ্ধান্তটি প্রযোজ্য তা নয়, বরং মজলিসের কার্যক্রম কী হওয়া উচিত (Term of reference) এবং আধুনিক ইসলামী রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে মজলিসের স্থান কী হওয়া উচিত এ প্রশ্নেও তা প্রযোজ্য। আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে বলতে হয়, মজলিসের আইনমূলক সিদ্ধান্তসমূহ শাসকের উপর বাধ্যতামূলক হবে কিনা এ প্রশ্নের বেলায়ও উপরোক্ত সিদ্ধান্তটি প্রযোজ্য।

ইহা ইতিহাস দ্বারা প্রমাণিত যে, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে রসূলুল্লাহ্ (সা) প্রায়ই তাঁর সাহাবাদের পরামর্শ চাইতেন ও তা মেনে নিতেন। আল্-কুরআনের নিম্নোক্ত বচনের প্রতি আনুগত্যবশতই তিনি এই নীতি অনুকরণ করেছেন ঃ

وشا ورهم فى الامر فاذا عزمت فتوكل على الله -

'সামাজিক ব্যাপার-বিষয়াদিতে (امر) তাঁদের সকলের সঙ্গে পরামর্শ কর এবং যখন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর তখন আল্লাহ্র উপর নির্ভর কর।'[১]

১. আল কুরআন, ৩ ঃ ১৫।

www.pathagar.com

এই আয়াতের শব্দবিন্যাস থেকে কোন কোন মুসলিম পন্ডিত মনে করেন যে, সমাজের নেতা পরামর্শ গ্রহণ করতে বাধ্য হলেও এ ব্যাপারে তিনি যেভাবে ভাল মনে করেন সেভাবেই তাঁর কাজ করার স্বাধীনতা রয়েছে। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের মূলে যে খেয়াল-খুশীপনা রয়েছে তা সে মুহূর্তেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন আমরা স্মরণ করি যে, আল-কুরআনের উক্ত আয়াতটি ওহুদের যুদ্ধের প্রাক্কালে অবতীর্ণ হয়েছিল; অর্থাৎ এমন এক ব্যাপারে এটা অবতীর্ণ হয়েছিল যখন রসূলুল্লাহ (সা) নিজের উৎকৃষ্টতর রায় বা অভিমতের বিরুদ্ধে তাঁর সাহাবাদের সংখ্যাগুরু অংশের পরামর্শ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁর সুনিশ্চিত অভিমত -- যার যৌক্তিকতা পরবর্তী ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয় -- এই ছিল যে, খোলা ময়দানে সংখ্যার দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠতর মক্কার কোরেশ বাহিনীর মুকাবিলা করা মুসলমানদের উচিত হবে না, বরং তাদের উচিত মদীনার বহিঃপ্রাচীরের অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করা। তাঁর এই মতে তিনি তাঁর কয়েকজন সাহাবীর সমর্থন পান, যেহেতু বাকী প্রায় সকলেই সম্মুখ-যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ার জন্য পীড়াপীড়ি করছিলেন সে কারণে তিনি দুঃখের সঙ্গে সংখ্যাগুরু ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করেন।

পরিষদের সংখ্যাগুরু অংশের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে নেতা যে শরীয়ার দিক দিয়ে বাধ্য তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা মিলে আল-কুরআনের বর্তমানে আলোচ্য আয়াতটি সম্পর্কে চতুর্থ খলীফা হযরত আলীর মাধ্যমে প্রাপ্ত একটি হাদীসে। এই আয়াতে উল্লিখিত 'আযম' (কর্মপন্থা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ) শব্দটির তাৎপর্য জিজ্ঞাসিত হলে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ

مشارة اهل الراى ثم اتباعهم -

অর্থাৎ 'বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন (اهل الراى) লোকদের পরামর্শ গ্রহণ এবং তাতে তাদের অনুসরণ।'[২]

হযরত আবূ বকর এবং হযরত ওমর (রা) যাঁদেরকে নিয়ে, আজকের দিনের ভাষায় বলতে গেলে, রসূলের 'অভ্যন্তরীণ মন্ত্রণাসভা' (inner council) প্রায়ই গঠিত হতো, তাঁদেরকে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলতেন ঃ

لوا جتمعتما فى مشورة ما خالفتكما -

'তোমরা দু'জন যদি কোন ব্যাপারে একমত হও আমি তোমাদের থেকে ভিন্ন মত দেব না।'[৩]

২. ইব্নে কাসীর, তফ্সীর (কায়রোঃ ১৩৪৩ হিঃ) ৫ ঃ ২, পৃষ্ঠা ২৭৭।
৩. মাসনাদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, আবদুর রহমান ইবনে গানাম-এর সনদ অনুসারে।

www.pathagar.com

তা সত্ত্বেও – امرهم شورى بينهم এই নীতি খুলাফায়ে রাশেদার খলীফারা কঠোরভাবে সব সময়ে পালন করেন নি তা অনুমান করা কঠিন নয়। একটি কারণ সুস্পষ্ট ঃ ইসলামী কমনওয়েল্‌থের (দ্বিতীয় অধ্যায়ে যার উল্লেখ করা হয়েছে) দ্রুত পরিবর্তনের ফলে কোন কোন সময় রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ভার জনসাধারণের উপর ছেড়ে দেওয়া সম্ভবপর ছিল না। কারণ, তারা যতই কল্যাণকামী এবং জ্ঞানী হোক না কেন, বিস্তৃত এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে সম্প্রসারণশীল রাজ্যের অভ্যন্তরে যা ঘটছিল তার প্রত্যেকটি ব্যাপারে সাম্প্রতিক খবর তারা রাখেন, এ ধারণা করা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া মহান খলীফা চতুষ্টয় এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন যে, সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার তখনও শৈশবকাল এবং এ কারণে তাদের রাজনৈতিক মতামত গোত্র ও গোষ্ঠীগত স্বার্থের দ্বারা অনুরঞ্জিত হওয়ার আশংকা সর্বদাই ছিল। তাই যদিও তাঁরা পরিষদ স্থাপন করেছিলেন এবং যখনই প্রয়োজন হয়েছে তখনই পরামর্শ চেয়েছেন, তবুও তাদের পরামর্শদাতাদের পরামর্শ গ্রহণ বা বর্জন করবার ব্যাপারে তাঁরা নিজেদেরকে স্বাধীন মনে করতেন। খুব সম্ভব, সে সময়ে এই ছিল তাঁদের একমাত্র উপায়। তা সত্ত্বেও, এটা খুবই সম্ভব যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে রাষ্ট্রপ্রধান এহেন বল্গাহীন স্বাধীনতা খিলাফতের দ্রুত পতনের অন্যতম কারণ ছিল। কারণ, উমরের মত অতিশয় দৃঢ় এবং অতিশয় দূরদর্শী ব্যক্তির ক্ষেত্রে স্বাধীনতা চমৎকার সুফলের কারণ হলেও যখনই কোন দুর্বল শাসক মারাত্মক ভুল সিদ্ধান্ত করেছেন তখন তা খিলাফত প্রথার অবমাননার কারণ হয়েছে। হযরত উসমান (রা) যদি যথাবিধি গঠিত মজলিস আশ্-শূরার সিদ্ধান্তসমূহ মেনে নিতে সব সময়ই নিজেকে বাধ্য (শব্দটির আইনগত অর্থে) মনে করতেন তাহলে কি গোটা মুসলিম ইতিহাসেরই ভিন্ন পথ অবলম্বন করার সম্ভাবনা ছিল না?

এ কাল্পনিক প্রশ্নের উত্তর যাই দেয়া হোক না কেন, প্রত্যেক আমীরই ওমরের মত লোকের প্রতিভা এবং লক্ষ্যে দৃঢ়তার অধিকারী হবেন এমন আশা করার পেছনে কোন যৌক্তিকতা নিশ্চয় আমাদের নেই। পক্ষান্তরে, সমগ্র ইতিহাসের রায় এই যে, এ ধরনের ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত বিরল ব্যতিক্রম এবং সকল কালে ও সকল সমাজে শাসকবর্গের বিপুল সংখ্যাগুরু অংশ কর্তৃক মারাত্মক ভুলের আশংকা থাকে, যদি তাঁদেরকে তাঁদের সম্পূর্ণ নিজস্ব পন্থা অনুসরণের সুযোগ দেয়া হয়। এ কারণে, তাঁদেরকে তাদের নিজস্ব পন্থা অনুসরণের ক্ষমতা দেয়া যেতে পারে না — শুধু গোটা সমাজের আস্থাভাজন প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শের মাধ্যমে তাঁদেরকে শাসন করার ক্ষমতা দেয়া যেতে পারে, এটা ইতিহাসের চিরন্তন শিক্ষাসমূহের এমন একটি শিক্ষা যা কোন জাতিই নিজের ধ্বংসকে ডেকে না এনে অবজ্ঞা করতে পারে।

www.pathagar.com

শাসকের ক্ষমতা

কাজেই আমরা এ সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছলাম যে, ইসলামী রাষ্ট্র পরামর্শের মাধ্যমে পরিচালিত হওয়া উচিত, অর্থাৎ আইন-বিভাগ ও শাসন-বিভাগের মধ্যে (উভয়ের নেতৃত্ব যেখানে একই ব্যক্তি, অর্থাৎ আমীরের উপর অর্পিত) অন্তরঙ্গ সহযোগিতার মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালিত হবে। কিন্তু সরকার পরিচালনার এই দু'টি বিভাগের মধ্যে টেকনিক্যাল সম্পর্ক কী হওয়া উচিত? সরকার পরিচালনার সমস্ত কাজ পরামর্শের মাধ্যমে সাধিত হওয়া উচিত أمرهم شورى بينهم এই নীতির তাৎপর্য কি এই যে, দৈনন্দিন প্রশাসনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ব্যাপার সম্পর্কে আইন পরিষদের আগাম সম্মতি গ্রহণ করতে শাসক বাধ্য? ব্যাপার যদি তাই হতো, তাহলে সরকার পরিচালনের কোন যন্ত্রই কখনো দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে সক্ষম হতো না। সম্ভবত এটা এমন একটা সমস্যা শরীয়া যার সম্মুখীন হয়নি। কাজেই এই উভয়-সংকটের একটা সমাধানের জন্য আমাদেরকে শরীয়ারই শরণ নিতে হবে, বস্তুত সমাধান আল-কুরআন থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। আল-কুরআনের নিম্নোদ্ধৃত আয়াতটি ইতিপূর্বে আমরা বিবেচনা করেছি(وشاورهم فى لامر فاذا عزمت فتوكل على الله) 'সমাজ সম্পর্কিত সকল ব্যাপারে তাদের পরামর্শ গ্রহণ কর এবং যখন কোন কর্মপন্থা বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো, তখন আল্লাহ্র উপর নির্ভর কর।'[৪] এই আয়াত থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে এসেছি যে, মজলিস আশ-শূরার সিদ্ধান্তসমূহ আমীর নিজের উপর বাধ্যতামূলক বলে মেনে নিতে বাধ্য। কিন্তু 'এবং তুমি যখন কোন কর্ম সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো তখন আল্লাহ্র উপর নির্ভর কর' বাক্যটি আমাদেরকে আরো একটি সিদ্ধান্তে উপনীত করে। যখনই আল-কুরআন কিংবা রসূলুল্লাহ্ (সা) তাওয়াক্কুলের (আল্লাহ্র উপর নির্ভর করার) প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলেন, প্রত্যেকবারই তাঁরা একইভাবে এমন সব ঘটনার কথা বলেন যা বিদ্যমান নসুসের আওতায় পুরোপুরি পড়ে না এবং সে কারণে সে সব কার্য কীভাবে সম্পন্ন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে ব্যক্তির বিচার-বুদ্ধির প্রয়োগের আহবান জানানো হয়। অন্য কথায় তাঁরা এমন সব কাজের কথা বলেন, যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির তার বিবেকের নির্দেশানুযায়ী পন্থা গ্রহণের কিছুটা স্বাধীনতা রয়েছে। আমাদের বর্তমানে আলোচ্য সমস্যাটির পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্তের সারকথা এইভাবে বিবৃত করা যায় ঃ

মজলিস আশ-শূরা কর্তৃক প্রণীত লৌকিক আইন এবং গুরুত্বপূর্ণ পলিসির প্রশ্নে মজলিস আশ-শূরার সিদ্ধান্তসমূহ আমীরের উপর বাধ্যতামূলক হলেও দৈনন্দিন প্রশাসন কার্যে এই সব সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ কিরূপে বাস্তবায়িত করা হবে

৪. আল-কুরআন, ৩ ঃ ১৫৯।

www.pathagar.com

তা তিনি যে শাসন বিভাগের উপর নেতৃত্ব করেন তারই উপর ছেড়ে দেয়া হয়; এবং অন্যদিকে যেসব লৌকিক আইনের ভিত্তিতে দেশ পরিচালিত হবে মজলিস যদিও সে সব ব্যাপারে আইন প্রণয়নের অধিকারী, অনুসৃতব্য গুরুত্বপূর্ণ পলিসি নির্ধারণে ক্ষমতাবান এবং সাধারণভাবে সরকারের কার্য তদারক করার ক্ষমতায় ক্ষমতাশালী, তবুও শাসন বিভাগের দৈনন্দিন কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করার অধিকার তার নেই। এ থেকে বোঝা যায় যে, 'শাসকের ক্ষমতা' এই শব্দ দু'টির পূর্ণ অর্থে শাসন ক্ষমতা আমীরের অবশ্যই থাকা চাই। বাস্তব ক্ষমতা বর্জিত এবং নামমাত্র রাষ্ট্র প্রধানের পদ — যার দৃষ্টান্ত প্রাক-দ্যগলীয় ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট অথবা ইংল্যান্ডের রাণী — আল্-কুরআনের এই নির্দেশের আলোকে স্পষ্টতই বাহুল্য যে, 'যাঁরা কর্তৃত্বে আছেন' **(اولى الامر)** [৫] তাঁদের প্রতি আনুগত্য আল্লাহ্ এবং রসূলের আনুগত্যের স্বাভাবিক ফল।

সরকারের কাঠামো

অবশ্য আমীরকে পূর্ণ শাসন-ক্ষমতা দেয়া হলেও প্রশ্ন থেকেই যায়। প্রশ্নটি এই যে, ঐ সব ক্ষমতা এবং তৎপ্রসূত কর্ম শুধু কি একা তাঁরই উপর ন্যস্ত হবে (যেমন যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেন্টের নজীর) অথবা তিনি কি মজলিস আশ্-শূরার প্রধান দলগুলোর প্রতি প্রতিনিধিত্বমূলক ও তাঁদের কার্যকালের স্থায়ীত্বের জন্য মজলিসের আস্থা ভোটের উপর নির্ভরশীল একটি মন্ত্রিসভার সহযোগিতায় যেন তাঁদের সঙ্গে শরীকানা ভিত্তিতে তাঁর 'ক্ষমতা ব্যবহার ও দায়িত্ব পালন করবেন?'

এ দু'টো বিকল্পের কোনটির ব্যাপারেই কোন সুস্পষ্ট 'শরয়ী' বিধান নেই। তবুও বহু সহীহ্ হাদীসের বাক-ভঙ্গি থেকে দেখা যায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) শাসন সংক্রান্ত সকল দায়িত্ব একটি মাত্র ব্যক্তির (যাকে তিনি বিভিন্ন সময়ে 'আমীর' অথবা 'ইমাম' বলে বর্ণনা করেছেন) হাতে কেন্দ্রীভূত করার কথা বিবেচনা করেছেন — যা ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্দেশ্য রূপায়ণের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। ঐ রকম ক'টি হাদীস নিম্নে উদ্ধৃত হচ্ছে ঃ

من اطاعنى فقد اطاع الله ومن عصانى فقد عصى الله ومن يطع الامير فقد اطاعنى ومن يعص الامير فقذ عصانى واماالامام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به -

'যে আমাকে মানে সে আল্লাহ্কে মানে এবং যে আমাকে অমান্য করে সে আল্লাহ্কে অমান্য করে এবং যে আমীরকে মানে সে আমাকে মানে এবং যে

৫. আল-কুরআন, ৪ ঃ ৫৯

www.pathagar.com

আমীরকে অমান্য করে সে আমাকে অমান্য করে। দেখ, নেতা (امام) একটা ঢাল মাত্র, যার আড়ালে থেকে লোক সংগ্রাম করে এবং যার সাহায্যে নিজেদের রক্ষা করে।'[৬]

الا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالامام الذى على الناس راع وهم مسئول عن رعيته -

'নিশ্চয়ই তোমাদের প্রত্যেকেই এক একজন রাখাল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তার পালের জন্য দায়ী, (এইভাবে) নেতা যাঁর ক্ষমতা সকল জাতির উপরে, তিনি তাঁর পালের জন্য দায়ী। তিনিও একজন রাখাল।'[৭]

من بايع اماما فاعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ان اسطاع فان جاء اخرينا رعه فاخربوا عنق الاخر-

'যে ব্যক্তি তার হাত ও অন্তর দিয়ে ইমামের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেছে, সে পারলে (অর্থাৎ যতক্ষণ না তাকে কোন অন্যায় কার্যের নির্দেশ দেওয়া হয়) তার অনুসরণ করবে এবং যদি অন্য কোন ব্যক্তি ইমামের অধিকার হরণের চেষ্টা করে সেই ব্যক্তির স্কন্ধে আঘাত করবে।'[৮]

এগুলোর এবং রসূলের এ-জাতীয় বাণীসমূহের পূর্ণ সঙ্গতি রয়েছে তাঁর আরেকটি অধিকতর সাধারণ আদেশের সঙ্গে। সে আদেশটি এই যে, যখনই মুসলমানদের কোন দল সাধারণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজে ব্যাপৃত হবে তখন তাদের উচিত তাদের পরিচালনের জন্য তাদের মধ্য থেকে একজন নেতা নির্বাচন করা।[৯] তা সত্ত্বেও কেউ কেউ হয় তো এ যুক্তি পেশ করতে পারেন যে, ইউরোপীয় পার্লামেন্টারী ধরনের সরকারও অর্থাৎ আইন পরিষদ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত এবং আইন পরিষদের নিকট সরাসরি দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভাও যে সর্বদাই এক ব্যক্তিক নেতৃত্ব-নীতির বিরোধী হবে তা না-ও হতে পারে; কারণ, ইসলামী রাষ্ট্রে মন্ত্রিসভার প্রধান হবেন 'আমীর' যাঁর মধ্যে আমরা রাষ্ট্রপ্রধান ও প্রধানমন্ত্রী উভয়ের কর্ম ও দায়িত্বের সম্মিলন দেখতে পাই। অবশ্য কাণ্ডজ্ঞান থেকে আমরা বুঝতে পারি, এ ধরনের একটা ব্যবস্থা আমীরের অবস্থাকে অত্যন্ত অস্বাভাবিক করে তোলে। একদিকে মনে করা হয় তিনি স্বাধিকারবলে কর্তৃত্বের

---

৬. আল বুখারী ও মুসলিম, আবূ হুরায়রার সনদ অনুসারে।
৭. ঐ, সনদ আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর।
৮. মুসলিম, সনদ আবদুল্লাহ ইবনে ওমর।
৯. সম্পর্কিত প্রায় সকল সহীহ্ হাদীস মুহাম্মদ ইবনে আলী আল-শওকানী কর্তৃক তাঁর অমর গ্রন্থ নাইল-অল-আওতারের (কায়রোতে প্রকাশিত), ১৩৪৪ হিঃ) ৯ম খণ্ডে ১৫৭-১৫৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত ও বিশ্লেষিত হয়েছে।

www.pathagar.com

অধিকারী শাসক, কারণ জনসাধারণ কর্তৃক তিনি নির্বাচিত, অথচ অন্যদিকে তাঁকেই ব্যক্তিগতভাবে আইন পরিষদের প্রতি দায়িত্বশীল কতিপয় মন্ত্রীর একটা দলকে তাঁহার শাসন সংক্রান্ত দায়িত্বের অংশ দিতে হয়। এভাবে 'আমীর' নন, মজলিসের প্রতিনিধিরূপে প্রেরিত পার্টিগুলোই হবে রাষ্ট্রের সকল শাসনক্ষমতার চূড়ান্ত উৎস। এ ধরনের একটি ব্যবস্থা 'নেতৃত্ব-সম্পর্কিত ইসলামী ধারণার বিরোধী তো হবেই; এ ছাড়াও, এ ব্যবস্থার ফলে সরকারের পলিসি বিভিন্ন এবং কখনো কখনো পরস্পর বিরোধী পার্টি কর্মসূচীর মধ্যে সর্বদাই একটা আপোস-রফা, বরং বলা যায় অন্তহীন একটানা আপোস-রফার উপর নির্ভরশীল হবে এবং এতে করে সেই একনিষ্ঠতা এবং অভ্যন্তরীণ ধারাবাহিকতা কখনো অর্জিত হতে পারে না যা ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষে নেহাতই অপরিহার্য।

যে সব সমাজ কোন সুনিশ্চিত আদর্শের দ্বারা সঞ্জীবিত নয় বলে কোন বিশেষ অবস্থায় সঠিক কর্মপন্থা কী হবে সে সম্পর্কে জনসাধারণের পরিবর্তনশীল মতামত অনুসারে সকল রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত করতে বাধ্য সে সব সমাজে পরস্পর বিরোধী পার্টির কর্মসূচীর মধ্যে আপোস-রফার উপরোক্ত নীতি প্রয়োজন হয় এবং কখনো কখনো নৈতিকতার দিক দিয়ে তা সঙ্গতও হতে পারে। কিন্তু আদর্শভিত্তিক ইসলামী রাষ্ট্রে 'ভাল' এবং 'মন্দের' ধারণার সুনির্দিষ্ট অর্থ ও তাৎপর্য আছে এবং সম্ভবত এ সব ধারণা সময়-সুবিধার উপর নির্ভর করতে পারে না। এ জাতীয় রাষ্ট্রে শুধু আইন-প্রণয়ন কার্যই নয়, প্রশাসন নীতিও। সমাজ যে আদর্শ পূর্বাহ্নে স্বীকার করে নিয়েছে সর্বদাই তার দ্যোতক হওয়া চাই এবং এটা কখনো সম্ভব নয় যদি সরকার তার দৈনন্দিন কার্যকলাপ পরিবর্তনশীল দলীয় রাজনীতিবিদদের বিবেচনাধীন রাখতে বাধ্য হয়। এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে, ইসলামী আইন পরিষদে 'একাধিক দল' থাকতে নেই। মতামত এবং সমালোচনার স্বাধীনতাকে যদি নাগরিকের জন্মগত অধিকার (ইসলামের রাষ্ট্রনৈতিক ধারণায় নিঃসন্দেহেই এটা জন্মগত অধিকার) বলে স্বীকার করে নেওয়া হয় তাহলে বিভিন্ন ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় পলিসি কী হওয়া উচিত সে সম্পর্কে একই ধরনের বিশেষ বিশেষ মতামত প্রচারের, অবশ্যই যদি জনসাধারণ দল গঠন করতে চায়, তাদের সেই স্বাধীনতা অবশ্যই দিতে হবে এবং যদি সেই সব মতামত রাষ্ট্র যে আদর্শের উপর স্থাপিত তার অর্থাৎ শরীয়ার বিরোধী না হয় তাহলে মজলিস আশ্-শূরার অভ্যন্তরে ও বাইরে সে সব সম্পর্কে তর্ক-বিতর্কের অধিকার এভাবে গঠিত পার্টিগুলোর অবশ্যই থাকবে। অবশ্য দল গঠনের এবং স্ব স্ব দলের কর্মসূচীর ওকালতির স্বাধীনতা যাতে সরকারের প্রশাসনিক পদ্ধতিকে প্রভাবিত করতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রশাসন পদ্ধতির উপর এ প্রভাব অবশ্যই পড়বে — মজলিসে যে সব

www.pathagar.com

পার্টির প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন সরকার সেই সব পার্টি থেকে নির্দেশপ্রাপ্ত হলে এবং সে সব পার্টির প্রতি দায়িত্বশীল মন্ত্রীবর্গের দ্বারা পরিচালিত হলে।

এ সবের পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয়, পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থা — যাতে আইন পরিষদের প্রতি যুক্তভাবে ও পৃথকভাবে দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা শাসন-ক্ষমতায় অংশগ্রহণ করেন, তার চেয়ে প্রেসিডেন্সিয়াল শাসন ব্যবস্থা — যা যুক্তরাজ্যে প্রচলিত শাসন-ব্যবস্থার কিছুটা কাছাকাছি ইসলামী রাষ্ট্র-ব্যবস্থার লক্ষ্যের সঙ্গে অধিকতর নিকট-সম্পর্কিত। অন্য কথায়, শুধুমাত্র আমীরের উপরই সকল প্রশাসনিক ক্ষমতা ও কার্যভার ন্যস্ত হবে এবং সরকারের পলিসির জন্য শুধুমাত্র তাঁকেই মজলিসের প্রতি ও মজলিসের মাধ্যমে জনসাধারণের নিকট দায়ী থাকতে হবে। মন্ত্রীবর্গ প্রশাসন কার্যে তাঁর সহকারী বা সেক্রেটারীর বেশি কিছু হবেন না। প্রেসিডেন্ট তাঁদেরকে তাঁর নিজ ইচ্ছেমত নিয়োগ করবেন এবং তাঁরা শুধু প্রেসিডেন্টের কাছে দায়ী থাকবেন। বস্তুত 'ওয়াযীর' শব্দটি (সাধারণ ভাষায় 'মন্ত্রী' বলে যার অর্থ করা হয়) যা রসূলুল্লাহ্ (সা) সরকার পরিচালনা-সম্পর্কিত সমস্যার ক্ষেত্রে ব্যবহার করতেন, সেই শব্দটিরই দ্বারা এমন ব্যক্তিকে বোঝায় যে ব্যক্তি রাষ্ট্রপ্রধানকে তাঁর বোঝা বহনে সাহায্য করে। সংক্ষেপে, ওয়াযীর মানে হচ্ছে — প্রশাসনিক সহকারী।

যেমন দৃষ্টান্তস্বরূপ রসূল (সা) বলেছেন ঃ

اذا اراد الله بالامير خيرا جعل له وزير صدق ان نسى ذكره وان ذكر اعانه واذا ارد به غير ذالك جعل له وزير سوء ان نسى لم يذكره وان ذكره ولم يعنه -

'আল্লাহ্ যদি আমীরের মঙ্গল চান, তিনি তাঁকে বিশ্বস্ত সহকারী (ওয়াযীর) দান করেন, তিনি যখন ভুলে যান তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য এবং তিনি যখন স্মরণ করেন তখন তাঁকে সাহায্য করার জন্য এবং (আল্লাহ্) যদি তাঁর মঙ্গল না চান তিনি তাঁকে দুষ্ট সহকারী দান করেন, তিনি (রাষ্ট্রপ্রধান) যখন ভুলে যান সে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেয় না এবং তিনি যখন স্মরণ করেন সে তাঁকে সাহায্য করে না।'

তাই, মুসলমানেরা যদি তাদের রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রসমূহের জন্য এক ব্যক্তিকে শাসন-পদ্ধতি-সাধারণভাবে যা আজকার দিনে আমেরিকান ব্যবস্থা নামে পরিচিত — গ্রহণ করে তাহলে তাঁরা এমন একটি নীতিকে রূপায়িত করবেন যা রসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক তেরশ বছর পূর্বে অনুমোদিত হয়েছিল। তাঁরা যখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করবেন তখন শুধু এই তথ্যটিরই গুরুত্ব অনুধাবন করতে হবে। অবশ্য

www.pathagar.com

এক ব্যক্তিক পদ্ধতির সমর্থনে আরও একটি নীতি আছে।

আমরা জানি যে ইসলামী রাষ্ট্রে কর্তৃত্বের অধিকারীরা (اولوا الامر) অবশ্যই মুসলমান হবেন। যদি পার্টি প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে আইন পরিষদ থেকে নিযুক্ত মন্ত্রিসভার হাতে সরকারের শাসন-ক্ষমতা ন্যস্ত হয় — যা পশ্চিম ইউরোপীয় পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র-শাসিত ব্যবস্থার একটি রীতি বা প্রথা — তাহলে মজলিস থেকে অর্জিত ক্ষমতাবলে আমীরসহ এই মন্ত্রীবর্গই হবেন শাসকের কর্তৃত্বের অধিকারী এবং এক্ষেত্রে, কোন অমুসলিম কর্তৃক মন্ত্রিত্ব ক্ষমতার অধিকারী হওয়া শরীয়ার সুস্পষ্ট নির্দেশের বিরোধী হবে। কারণ, শরীয়ার নির্দেশানুসারে রাষ্ট্রের শাসন-বিভাগীয় কর্তৃত্ব থাকবে মুসলিমের হাতে। তাই সমাজ দু'টো বিকল্পের সম্মুখীন হবে ঃ হয় আইন করে সমস্ত মন্ত্রীপদের জন্যে অমুসলিমদের অযোগ্য ঘোষণা করতে হবে (যার ফলে আনুগত্যের সহিত রাষ্ট্রের সাথে সহযোগিতা করা অমুসলিম সংখ্যালঘুর পক্ষে একটা কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়াতে পারে)। অথবা বিনয়ের সঙ্গে শরীয়ার একটি মৌলিক নির্দেশকে অস্বীকার করতে হবে (যার অর্থ হচ্ছে রাষ্ট্র-সম্পর্কিত ইসলমী ধারণার মূলে আঘাত করা)। অবশ্য যদি শাসন বিভাগীয় সকল ক্ষমতা এবং বিশেষ অধিকার শুধুমাত্র আমীরের হাতেই থাকে, তাহলে তাঁর সরকারের সকল কাজের জন্য দায়িত্বশীল একমাত্র কর্তৃত্বাধিকারী স্পষ্টত তিনিই হবেন এবং মন্ত্রীবর্গ তাঁর সেক্রেটারী অথবা প্রশাসনিক সহকারীর বেশি কিছু হবেন না; আমীর তাঁদেরকে নিজের ইচ্ছেমত নিযুক্ত করবেন এবং স্বীয় পদে অন্তর্নিহিত বিশেষ কতকগুলো কাজ করবার ক্ষমতা অর্পণ করবেন। এই সব সেক্রেটারী যেহেতু পলিসি নির্ধারণের জন্য দায়ী হবেন না সে কারণে এঁরা নিজস্ব অধিকারবলে কর্তৃত্বাধিকারী (اولى الامر) বলে বিবেচিত হতে পারেন না। সুতরাং মন্ত্রীপদে কোন অমুসলিমের নিযুক্তির বিরুদ্ধে কোন 'শরয়ী' আপত্তি থাকতে পারে না। এতে যে শুধু অমুসলিম নাগরিকদের বিরুদ্ধে একটা অন্যায় ভেদ-নীতিকেই রোধ করা হবে তা-ই নয়-উপরন্তু, এতে করে সরকারের পক্ষে মেধা ও প্রতিভার ভিত্তিতে দেশের সকল শ্রেষ্ঠ প্রতিভাকেই কাজে লাগানো সম্ভবপর হবে।

প্রায় সকল মুসলিম দেশের যে উল্লেখযোগ্য অমুসলিম সংখ্যালঘু রয়েছেন কেবল এ কারণেই রাষ্ট্রপরিচালনের তথাকথিত প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির পক্ষে সিদ্ধান্ত অনুকূলে হওয়া উচিত।

আইন-বিভাগ ও শাসন-বিভাগের মধ্যে ঐক্য বিধান

এ সবের সঙ্গে, امرهم شورى بينهم আল-কুরআনের এই নির্দেশ কখনো মিশ্রিত হওয়া উচিত নয়। আমরা দেখেছি এই নির্দেশ দ্বারা প্রধান প্রধান

www.pathagar.com

সকল সরকারী কাজকর্ম সমাধা করার জন্য আলাপ-পরামর্শের উপর প্রত্যক্ষভাবে তাগিদ দেয়া হয়েছে। তত্ত্বের দিক দিয়ে এই প্রয়োজনটি মজলিস আশ্-শূরা নামক প্রতিষ্ঠান দ্বারা পূর্ণভাবে সাধিত হতে পারে। এই প্রতিষ্ঠান সকল গুরুত্বপূর্ণ পলিসির ব্যাপারে যেমন তার নিজ রায় দেবে তেমনি যে সব লৌকিক আইন দ্বারা দেশ শাসিত হবে সেগুলো গড়ে তুলবে। অবশ্য ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কার্যটি মোটেই এতটা সহজ নয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রতিটি ছাত্রই এ ব্যাপারে অবহিত যে, বিস্ময়কর শোনালেও আইন পরিষদ নয়, বরং সরকারের শাসন বিভাগীয় শাখাগুলোই আধুনিক রাষ্ট্রে প্রায় সকল আইন তৈরি করে থাকে। সাধারণত হাল আমলে যে কোন গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়নের জন্যই বিশেষজ্ঞদের ব্যাপক প্রস্তুতি ও গবেষণা, সংশ্লিষ্ট সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো সম্পর্কে সামগ্রিক জ্ঞান এবং সর্বশেষ, রচিতব্য আইন বা আইনগুলো সূত্রবদ্ধ করার জন্য আইনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সূক্ষ্ম দৃষ্টির দরকার হয়। এটা সুস্পষ্ট যে, ব্যাপক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত পরিষদের কাছ থেকে এতটা বিশেষজ্ঞের জ্ঞান ও টেকনিক্যাল দক্ষতা আশা করা যায় না। কারণ, নির্বাচকমন্ডলীর নিকট স্বভাবতই প্রার্থীদের ব্যক্তিগত গুণ, তাঁদের সামাজিক চরিত্র ও বুদ্ধিমত্তার খ্যাতি বিবেচ্য এবং আইন প্রণয়নের জন্য প্রার্থীর টেকনিক্যাল যোগ্যতা আছে কিনা তা নির্ধারণের অবকাশ তাদের নেই। একথা সম্পূর্ণ বাদ দিলেও আধুনিক পার্লামেন্ট তুলনামূলকভাবে স্বভাবতই যে বিপুলসংখ্যক সদস্যদের দ্বারা গঠিত হবে তার ফলেই কোন পুঙ্খানুপুঙ্খ আইন অধ্যয়ন, রচনা এবং তার খসড়া তৈরি করা দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে উঠবে। এ কারণে আধুনিক রাষ্ট্রে প্রাসঙ্গিক গবেষণা কক্ষে প্রস্তুতি ও মুসাবিদা তৈরি এবং প্রায়শ সূত্রপাত করার কাজও শাসন বিভাগের দায়িত্ব। আইন প্রণয়নমূলক প্রধান প্রধান সকল বিলই (Bill) এ-কাজের জন্য বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত আমলাদের দ্বারা বিশেষজ্ঞের যোগ্যতার সহিত সরকারের শাসন-বিভাগগুলোতেই প্রস্তুত হয় এবং তৎপর আলোচনা, সম্ভাব্য সংশোধনী এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য আইন পরিষদের সামনে উপস্থাপিত হয়।

ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিতে জনসাধারণের সম্মতির প্রশ্নে এ ধরনের একটা পদ্ধতি সম্পূর্ণ সন্তোষজনক হতে পারে। কারণ স্পষ্টতই আইন সংক্রান্ত কোন ব্যবস্থাই মজলিস আশ-শূরায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে সংশোধনীসহ অথবা সংশোধনী ব্যতিরেকে তা গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত আইনে পরিণত হতে পারে না। অবশ্য জনসাধারণের সম্মতিই আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে ইসলামী শর্তে প্রথম এবং শেষ কথা নয় **امرهم شورى بينهم** আল-কুরআনের এই নীতি শর্তহীনভাবে এই দাবি করে যে, সরকারের সমস্ত

www.pathagar.com

কাজকর্ম (আইন প্রণয়ন এবং শাসন-উভয়ক্ষেত্রে) হবে আলোচনা-পরামর্শের প্রত্যক্ষ ফল। সরকারের শাসন বিভাগকে প্রতি পদক্ষেপে বাধাগ্রস্ত না করে এবং এভাবে শাসন বিভাগের কর্মের স্বাধীনতা ধ্বংস না করে এটা কি করে সম্ভবপর হতে পারে? আমার মতে, এই সমস্যার একটিমাত্র সমাধানই আছে।

আমরা জানি আধুনিক সকল পার্লামেন্টে সরকারের বিশেষ সমস্যার মুকাবিলা করার জন্য বিশেষ কমিটিসমূহ গঠিত হয়ে থাকে, যেমন — বৈদেশিক ব্যাপার সংক্রান্ত কমিটি, জাতীয় প্রতিরক্ষা কমিটি, বিচার বিভাগীয় কমিটি। পরিষদের সদস্যগণ কর্তৃক মনোনীত এইসব কমিটির কাছে বিভিন্ন সময়ে শাসন বিভাগকে তার অনুসৃত বিভিন্ন পলিসির যৌক্তিকতা প্রদর্শন করতে হয় এবং প্রশাসনিক কার্য কিভাবে চালাতে হবে শাসন বিভাগকে এদের কাছ থেকে তার প্রাথমিক অনুমোদন পেতে হয়। এই পদ্ধতি অনুসরণের ফলে পার্লামেন্টের অধিবেশনে পরবর্তী বিতর্ক স্বভাবতই সহজ হয়ে ওঠে। যাই হোক, পার্লামেন্টারী কোন কমিটির এবং পরে সমগ্র পরিষদের অনুমোদন বা অননুমোদন সরকারের শাসন সংক্রান্ত পলিসি সম্পর্কে একটা উত্তরকালীন রায় মাত্র। অর্থাৎ পরিষদ মাত্রই (অথবা এর কোন একটি পার্লামেন্টারী কমিটি) শাসন বিভাগের চলতি কার্যাবলীর সঙ্গে শুরু থেকে তো কখনই নয়, শুধু কতিপয় বিরল ক্ষেত্রে এমনভাবে মুক্ত থাকে যা 'আম্‌রুহুম শূরা বায়নাহুম' আল-কুরআনের এই নির্দেশের পূর্ণ রূপায়ণ মনে হতে পারে। এই নির্দেশ যৌক্তিকভাবে মেনে চলতে গিয়ে সরকারের শাসন ও আইনের খসড়া তৈরির কার্যকলাপের সঙ্গে ইসলামী আইন পরিষদের পার্লামেন্টারী কমিটিগুলোর পূর্ণভাবে অবশ্যই সমন্বয় সাধন করতে হবে। এটা সম্ভব হতে পারে (ক) প্রত্যেকটি কমিটির সদস্যসংখ্যা একটা ক্ষুদ্র সংখ্যার মধ্যে সীমিত করে এবং (খ) কমিটিকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর (অথবা সেক্রেটারী অব্ স্টেট-এর) উপদেষ্টা পরিষদের দায়িত্ব অর্পণ করে। এভাবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল প্রশাসনিক পলিসি এবং আইন জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শ করে তৈরি হতে পারে এবং যুগপৎ সরকারের কর্মক্ষমতাও অনাহত রাখা যেতে পারে।

আইন পরিষদ ও শাসন-বিভাগের মধ্যে বিতর্কের ফয়সালা

এখানে গুরুত্বপূর্ণ এই প্রশ্নটি থেকে যাচ্ছে যে, মজলিস আশ্-শূরা এবং শাসন বিভাগের মধ্যে মতানৈক্য ঘটলে কি করা উচিত? শাসন-বিভাগের কাজ-কর্মের সঙ্গে মজলিসের পার্লামেন্টারী কমিটিগুলো অন্তরঙ্গভাবে জড়িত থাকলেও এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে, মজলিস সরকার কর্তৃক আরদ্ধ

www.pathagar.com

(sponsored) কোন প্রশাসনিক ব্যবস্থা বা পলিসি সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন উচিত মনে করছে। কারণ পরিষদের সংখ্যাগুরু অংশের মতানুসারে সেই পলিসি বা প্রশাসনিক ব্যবস্থা বর্তমান কোন কোন আইনের বিরোধী, অথবা তা পরিষদ সদস্যগণ যাকে রাষ্ট্রের সর্বোত্তম স্বার্থ বলে মনে করেন তার পক্ষে ক্ষতিকর; ঠিক যেমন এ-ও ধারণা করা যায় যে, অনুরূপ কারণেই কখনো কখনো মজলিসের সংখ্যাগুরু অংশের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আপত্তি করা আমীরের কাছে বিবেকের অমোঘ নির্দেশ বলে মনে হতে পারে। এর ফলে যে মতের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় তা অচলাবস্থা সৃষ্টি করতে পারে, যার সমাধান, এ ধরনের জরুরী অবস্থায় ইউরোপের গণতন্ত্র-শাসিত সরকারগুলো কর্তৃক সাধারণভাবে অবলম্বিত পন্থার মাধ্যমে সহজসাধ্য নয় — যেমন সরকারের পদত্যাগ অথবা পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দিয়ে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠান। একদিকে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান শাসনকর্তা সমগ্র সমাজ বা জাতি কর্তৃক নির্বাচিত আর এই সমাজ বা জাতি (তাঁকে যে নির্বাচন করেছে শুধু এ কারণেই) আমীরের কথা শুনতে ও পালন করতে নিজেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যতক্ষণ না আমীর ইচ্ছাকৃতভাবে ইসলামের আইন অমান্য করে শাসনকার্য চালান। পক্ষান্তরে, মজলিস আশ্-শূরার সংখ্যাগুরু অংশের সিদ্ধান্তসমূহ অমান্য করার অথবা উপেক্ষা করার অধিকার আমীরের নেই। কোন সরকার বিশেষ কোন ব্যাপারে পরিষদের সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত না হলে গণতন্ত্রশাসিত পশ্চিমা রাষ্ট্রসমূহের সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন পরিষদগুলো যেমন সে সরকারের প্রতি আস্থা প্রত্যাহারের অধিকার দাবি করতে পারে, মজলিস আশ-শূরা তাও দাবি করতে পারে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও মজলিস ইসলামের বিতর্কাতীত নস্-নির্দেশসমূহ এবং নৈতিক মূল্যবোধও তুলে ধরতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ; কারণ, সমগ্রভাবে জাতি আমীরের প্রতি যে আনুগত্যের অঙ্গীকার করে ব্যক্তিগতভাবে মজলিসের প্রতিটি সদস্যই সেই একই আনুগত্যের অঙ্গীকার করে। কাজেই অচল অবস্থাটি আপাতদৃষ্টিতে অসমাধ্য বলে মনে হয়। কিন্তু শুধু আপাতদৃষ্টিতেই, কারণ এখানেও আল-কুরআন উভয় সংকট থেকে মুক্তির একটা পথ নির্দেশ করে। তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা আল-কুরআনের নিম্নোক্ত নির্দেশটি বিবেচনা করেছি ঃ

اطيعوا الله واطيعوا الرسول واو لى الامر منكم -

'আল্লাহ্‌কে মানো এবং রসূলকে ও তোমাদের মধ্যে যাঁরা কর্তৃত্বে আছে তাদের মানো।' কিন্তু এই উদ্ধৃতিতে আমরা আয়াতের শুধু প্রথমাংশটি পেয়েছিলাম; এর দ্বিতীয়াংশটি নিম্নরূপ ঃ

www.pathagar.com

فان تناز عتم فی شئی فردوه الی الله والرسول -

'তারপর যদি কোন ব্যাপারে তোমাদের মতানৈক্য হয় সে সম্পর্কে আল্লাহ্ এবং রসূলের শরণ লও।' তাহলে স্পষ্টতই যখন মজলিস আশ-শূরা এবং 'তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বে আছে তাদের (অর্থাৎ আমীরের)' মধ্যে কোন মৌলিক বিরোধ ঘটে তখন উভয়পক্ষ কর্তৃক বিতর্কের বিষয়টি সম্পর্কে আল-কুরআন এবং সুন্নাহ্র রায় গ্রহণ করা উচিত। আরো স্পষ্ট ভাষায়, এ ব্যাপারে এমন একদল মধ্যস্থের মত গ্রহণ করা উচিত যাঁরা সমস্যাটির নিরপেক্ষ বিচারের পর পরস্পর-বিরোধী দু'টি মতের মধ্যে কোন্‌টি আল-কুরআন এবং সুন্নাহ্র মর্মের নিকটতর সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। এর থেকে শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের জন্য সৃষ্ট সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রাইব্যুনালের মত সালিসি বা মধ্যস্থতার জন্য একটা নিরপেক্ষ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই ট্রাইব্যুনালের দায়িত্ব হবে (ক) আমীর এবং মজলিস আশ্-শূরার মধ্যে উদ্ভূত যে সকল মতানৈক্য উভয় পক্ষ কর্তৃক বিচার নিষ্পত্তির জন্যে ট্রাইব্যুনালের নিকট উপস্থাপিত হবে, সেসব ব্যাপারে রায় দানের এবং (খ) মজলিস আশ-শূরা কর্তৃক প্রণীত কোন আইন এবং আমীরের যে কোন প্রশাসনিক কাজ যা ট্রাইব্যুনালের সুচিন্তিত অভিমত অনুসারে আল-কুরআন এবং সুন্নাহর কোন নস্-নির্দেশের বিরোধী মনে হবে-তাতে ভেটো দেবার। কার্যত এই ট্রাইব্যুনাল হবে শাসনতন্ত্রের অভিভাবক।

বলা অনাবশ্যক যে, দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ আইনবেত্তাদেরকে নিয়ে এই ট্রাইব্যুনাল গঠিত হওয়া উচিত। এঁরা শুধু আল-কুরআন এবং হাদীস বিজ্ঞানেই পন্ডিত হবে তাই নয়, জাগতিক ব্যাপারাদি সম্পর্কে এঁদেরকে পূর্ণ ওয়াকিফহাল হতে হবে; কারণ শুধুমাত্র এমন সব ব্যক্তির পক্ষেই মানব-বুদ্ধির পক্ষে যতটুকু নিশ্চয়তা সম্ভব ততটুকু নিশ্চয়তার সঙ্গে রায় দান সম্ভব — মজলিস কর্তৃক প্রণীত কোন সন্দেহজনক আইন কিংবা আমীরের কোন প্রশাসনিক কাজ ইসলামের মর্মানুযায়ী হয়েছে কিনা।

'শরয়ী' অর্থে সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রাইব্যুনালটির গঠন যাতে আলোচনা-পরামর্শের মাধ্যমে স্থিরীকৃত হয় সেজন্য এর সদস্যদেরকে আমীর কর্তৃক উপস্থাপিত একটা নামের তালিকা থেকে মজলিস নির্বাচন করতে পারেন অথবা মজলিস কর্তৃক উপস্থাপিত নামের তালিকা থেকে আমীর বাছাই করে নিতে পারেন। এসব নিযুক্তি আমার মতে, আজীবনের জন্য হওয়া উচিত। কোন সদস্যের সক্রিয় কার্য একটা নির্দিষ্ট বয়সসীমা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হলেও তাঁর

www.pathagar.com

মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই মর্যাদা বজায় থাকা উচিত এবং তার পূর্ণ বেতন পাওয়া উচিত এবং তিনি শারীরিক কিংবা মানসিক দুর্বলতার কারণে তাঁর দায়িত্ব পালনে অসমর্থ না হলে অথবা তিনি অসদাচরণের অপরাধে দোষী না হলে (যে অপরাধ হলে তিনি তাঁর মর্যাদা এবং মাহিয়ানা ইত্যাদি সব কিছু থেকে বঞ্চিত হবেন) তাঁকে তাঁর সময় পূর্ণ হওয়ার আগে তাঁর সক্রিয় দায়িত্ব থেকে অপসারণ করা যাবে না। এবং সর্বশেষে আমি এ পরামর্শই দেব যে, ট্রাইব্যুনালের সদস্য হিসাবে কোন ব্যক্তি একবার নিযুক্ত হওয়ার পর তিনি অবসর গ্রহণ অথবা পদত্যাগের পর রাষ্ট্রের অন্য কোন পদ দখল করতে পারবেন না — সে পদ নির্বাচনমূলক হোক অথবা নিযুক্তিমূলক হোক, সবেতন হোক অথবা অবৈতনিক হোক; এ সম্পর্কে আইনগত নিষেধ থাকা দরকার। এভাবে ট্রাইব্যুনালের সদস্যরা আরো উচ্চাভিলাষ থেকে এবং কোন রাজনৈতিক দল বা দলীয় স্বার্থের সঙ্গে সহযোগিতা করার প্রলোভন থেকে মুক্ত থাকতে পারবেন এবং এ কারণে তাঁদের দায়িত্ব পালনে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ পরিমাণ নিরপেক্ষতা অর্জনে সমর্থ হবেন।

অবশ্য ট্রাইব্যুনালের সদস্য যে সকল সময়ই তাঁদের সিদ্ধান্তে একমত হবেন — এ ব্যাপারে কোন নিশ্চয়তা নেই; তাই যখনই মতৈক্যের অভাব ঘটেছে তখনই আমরা নতুন করে সংখ্যাগুরুর সিদ্ধান্তের শরণাপন্ন হওয়ার প্রয়োজন বোধ করি। কিন্তু সর্বসম্মত হোক বা না হোক রাষ্ট্রের সকল বিভাগ এবং সমগ্র সমাজের জন্য 'ট্রাইব্যুনালের' রায়কে অবশ্যই চূড়ান্ত ও বাধ্যতামূলক বলে মনে করতে হবে — যতক্ষণ না তা অনুরূপভাবে প্রাপ্ত পরবর্তী আর একটি রায় দ্বারা বাতিল হয়। এই শেষ শর্তটি গুরুত্বপূর্ণ; কারণ এটা খুবই ধারণা করা যায় যে, অন্য সময় এমন কি ট্রাইব্যুনালের অন্যরূপ গঠনও একই সমস্যা সম্পর্কে ভিন্ন সিদ্ধান্তের কারণ হতে পারে। আর এর অর্থ, এর বেশি বা কম নয় যে, এখানেও ইজতিহাদের দরজা কখনও বন্ধ করা যেতে পারে না।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

নাগরিক ও সরকার

আনুগত্যের আবশ্যকতা

'আমীর' যথাবিধি নির্বাচিত হলে বলা যায়, তিনি সমগ্র সমাজের আনুগত্যের (বায়াত) প্রতিশ্রুতি অর্জন করেছেন — অর্থাৎ যে সংখ্যাগুরু অংশ তাঁকে ভোট দিয়েছে শুধু তাদেরই আনুগত্য নয়, যারা তাঁর বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে তিনি তাদেরও আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি লাভ করেছেন। কারণ, সমাজ সম্পর্কিত যে সকল সিদ্ধান্ত শরীয়ার কোন বিধানকে লঙ্ঘন করে না, সে সব সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সংখ্যাগুরু অংশের মতামত সমাজের প্রতিটি সদস্যের উপরই বাধ্যতামূলক। তাই রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

يد الله على الجماعة" ومن شذ شذ فى النر من فارق الجماعة شبرا فقذ خلع الاسلام من عنقه -

'আল্লাহ্‌র হস্ত রয়েছে সমাজের (আল-জামাআহ্) উপর এবং যে কেউ তা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে, তাকে ছিন্ন করে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামের আগুনে। সমাজ থেকে যে ব্যক্তি হস্ত পরিমাণ ব্যবধানেও সরে পড়ে (ফারাকাল জামাআহ্) সে আর মুসলিম থাকে না, (শাব্দিক অর্থে) 'ইসলামকে সে নিজের কাঁধের উপর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।'[১]

ফলে সরকার যখন শরীয়াহ্ কর্তৃক আরোপিত শর্তগুলো পূরণ করতে সমর্থ হয়, তখন নাগরিকদের আনুগত্যের প্রতি সরকারের দাবি হয় নিরংকুশ।

তারা —

على السمع والطاعة فى العسر اليسر والمنشط والمكره -

'সংকটে এবং স্বাচ্ছন্দ্যে, প্রীতিকর এবং অপ্রীতিকর অবস্থায় (কথা) শুনতে এবং মেনে চলতে বাধ্য।'[২] সংক্ষেপে তাদেরকে অবশ্যই সরকারের পেছনে

১. আবূ দাউদ ও আহমদ ইবনে হাম্বল, আবূ যর বর্ণিত।
২. আল-বুখারী ও মুসলিম, উবাদা ইবনে আস্-সামিত বর্ণিত।

www.pathagar.com

ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়াতে হবে এবং তাদের সমস্ত ব্যক্তিগত আরাম, স্বার্থ, স্বত্ব এমন কি নিজেদের জীবন পর্যন্ত কুরবান করার জন্য তাদের অবশ্যই প্রস্তুত থাকতে হবে — কারণ দেখ,

ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة –

'আল্লাহ্ বেহেশ্তের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাসীদের জান এবং মাল খরিদ করে নিয়েছেন।'[৩]

এর তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ এবং তদীয় রসূলের নামে এবং ইসলামের বিধান অনুযায়ী যদি কোন সরকার দেশ শাসন করে, সমাজের স্বার্থে এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রয়োজনে যখনই দরকার হবে, নাগরিকদের সমস্ত সম্পদ তলব করার অধিকার সেই সরকারের থাকবে — তাদের ব্যক্তিগত সম্পদ এমন কি তাদের জীবন পর্যন্ত সে সরকার দাবি করতে পারবে। অন্য কথায়, সরকার (ক) আল-কুরআন এবং সুন্নাহর অমোঘ বিধান যে 'যাকাত'-কর তার উপরেও সমাজের কল্যাণের জন্য প্রয়োজন হলে অতিরিক্ত যে কোন কর বা শুল্ক ধার্য করতে পারবেন, (খ) জনস্বার্থের বিষয় হিসাবে যখনই রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালনার প্রয়োজন হবে সরকার তখনি বিশেষ বিশেষ ধরনের সম্পত্তিতে, উৎপাদন-পদ্ধতি অথবা খনিজ সম্পদে ব্যক্তিগত মালিকানার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করতেও (গ) রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার জন্য, প্রত্যেকটি সমর্থদেহ নাগরিককে বাধ্যতামূলক সৈনিকবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য করতে পারবেন।

জিহাদের প্রশ্ন

এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য যেহেতু ইসলামী রাষ্ট্রের ধারণার অন্তর্নিহিত গঠনতান্ত্রিক মৌলিক নীতিসমূহের বিচার-বিশ্লেষণ, তাই প্রশাসনিক প্রয়োজনানুযায়ী রাষ্ট্র নাগরিকদের উপর যেসব আইনের বলে কর ধার্য এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতা আরোপ করতে পারে, এখানে তার খুঁটিনাটি নিয়ে ভাবনার প্রয়োজন নেই। তবে সামরিক বৃত্তির ব্যাপারে নাগরিকদের বাধ্যবাধকতা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা অবশ্যই দরকার। এই বাধ্যবাধকতার প্রশ্নটি স্পষ্টতই জিহাদের ধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত এবং আমরা জানি, ইসলামের প্রায় সকল অমুসলিম সমালোচকই জিহাদের কুৎসিত অপব্যাখ্যা করেছেন এবং যেসব মুসলিম ফকিহ্ নিজেরাই এ ধরনের অপব্যাখ্যা করেছেন, তাঁদের সংখ্যাও কম নয়।

---

৩. আল্-কুরআন ৯ ঃ ১১১।

www.pathagar.com

'জিহাদ' শব্দটি 'জাহাদা' থেকে নিষ্পন্ন। 'জাহাদা' মানে দৃশ্যত যা কিছু মন্দ বা অকল্যাণকর তার বিরুদ্ধে 'সে চেষ্টা করেছিল বা নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল।' তাই দেখতে পাই রসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে প্রবৃত্তি এবং দুর্বলতার বিরুদ্ধে সংগ্রামকে (জিহাদ আন-নাফ্স) 'সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ' বলে বর্ণনা করেছেন।[৪] বাস্তব যুদ্ধের বেলায় আল-কুরআনে 'জিহাদ' শব্দটি শুধুমাত্র প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ বুঝাতেই ব্যবহৃত হয়েছে। মানুষের ধর্মের স্বাধীনতা, তার দেশের স্বাধীনতা এবং তার সমাজের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধই হচ্ছে জিহাদ ঃ

اذن للذين يقتلون بانهم ظلموا وان الله على نضرهم لقدير- الذين اخرجوا من يارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومسا جديذكر فيها اسم الله كثير-

'যুদ্ধের অনুমতি তাদেরকে দেওয়া হয় যাদের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে যুদ্ধ করা হচ্ছে এবং আল্লাহ অবশ্যি তাদেরকে সাহায্য করতে সমর্থ ঃ যারা শুধু এই কারণে তাদের ঘর-বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়েছে যে তারা বলত, 'আমাদের প্রতিপালক হচ্ছেন আল্লাহ্।' এবং আল্লাহ্ যদি কিছু লোকের দ্বারা অন্য লোককে প্রতিহত না করতেন তাহলে ইহা নিশ্চিত যে মঠ, গীর্জা, সিনাগগ ও মসজিদ যে সব স্থানে আল্লাহ্র নাম ঘন ঘন উচ্চারিত হয় সেগুলো বিধ্বস্ত হয়ে যেত।'[৫]

একথা মনে রাখতে হবে যে, আল্-কুরআনে 'জিহাদ' সম্পর্কিত সর্বপ্রথম উল্লেখ ইহাই। সকল হাদীসই এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত।[৬] উপরে উদ্ধৃত দু'টো আয়াতে আল-কুরআন শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার মৌলিক নীতি ঘোষণা করেছেন — যে নীতির কারণেই শুধু যুদ্ধ নীতিসঙ্গত বলে গণ্য হতে পারে। তাছাড়া, 'মঠ, গীর্জা, সিনাগগ ও মসজিদের' উল্লেখ দ্বারা এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, মুসলমানেরা শুধু তাদের নিজেদের সমাজেরই রাজনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক আযাদী রক্ষা করবে না, তাদের মধ্যে যেসব অমুসলিম বাস করে, তাদের আযাদীও রক্ষা করবে।

---

৪. দেখুনঃ আল-বায়হাকী, 'আল-সুনান আল-কুবরাহ'-জাবির ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণিত।
৫. কুরআন, ২২ ঃ ৩৯-৪০।
৬. দেখুন ইবনে কাসির। তফসির (কায়রো ঃ ১৩৪৩ হিজরী) ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৯২

www.pathagar.com

ইসলাম কোন অবস্থায়ই আক্রমণাত্মক যুদ্ধ অনুমোদন করে না ঃ

وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لايحب المعتدين - وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين- لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلونكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم- ان الله يحب المقسطين -

'তাদের বিরুদ্ধে তোমরা আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করো, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, কিন্তু তোমরা নিজেরা আক্রমণ করো না; কারণ, জেনে রাখো, আল্লাহ্ আক্রমণকারীকে পছন্দ করেন না।'[৭] এবং তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করো যতক্ষণ না অত্যাচার নির্মূল হয় এবং মানুষ মুক্তভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে সক্ষম হয়, (শাব্দিক তরজমায়, 'ধর্ম আল্লাহ্‌র জন্য হয়')। 'কিন্তু যদি তারা নিবৃত্ত হয়, তাহলে সমস্ত বিরুদ্ধতা বন্ধ করতে হবে — শুধু অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে ছাড়া'[৮] (অবিশ্বাসীদিগের মধ্যে) যারা (তোমাদের) দীনের কারণে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের ঘর থেকে তোমাদেরকে বহিষ্কৃত করেনি, তাদের প্রতি সদয় হতে ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই যারা ন্যায়বিচার করে আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসেন।'[৯]

যে সব হাদীস মুসলমানদেরকে জিহাদের তাগিদ দেয় আল-কুরআনের এসব দ্ব্যর্থবোধকতামুক্ত, স্ব-ব্যাখ্যামূলক বিধানসমূহের আলোকেই সেগুলো পড়তে হবে। রসূল (সা) যখনি জিহাদের গুণ সম্পর্কে বলেছেন, তিনি হয় সেই মুহূর্তে যে যুদ্ধ সংঘটিত হচ্ছিল তার উল্লেখ করেছেন অথবা ভবিষ্যতের কোন যুদ্ধের প্রসংগে তা বলেছেন, এমন যুদ্ধ যা আল-কুরআনে লিপিবদ্ধ শর্তাবলী পূরণ করে, যেমন করেছিল তাঁর নিজের যুদ্ধসমূহ। শুধু এই ধরনের যুদ্ধকেই 'আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ' (জিহাদ সম্পর্কিত প্রায় সকল হাদীসেই এই পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়েছে) বলে এবং সে কারণে, এসব যুদ্ধকে শরীয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে ন্যায়সঙ্গত ও পুণ্যকর্ম বলে গণ্য করা যেতে পারে।

ইসলামী রাষ্ট্রের ধারণা আল-কুরআন ও সুন্নাহ্‌র শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত; তাই এ ধারণা ইসলামী সরকারকে আক্রমাণাত্মক যুদ্ধ পরিচালনার মনোভাব

৭. কুরআন, ২ ঃ ১৯৩।
৮. কুরআন, ২ ঃ ১৯৩।
৯. ঐ, ২৮ ঃ ৬০ ঃ ৮।

www.pathagar.com

থেকে স্বতই নিবৃত্ত করে। বস্তুত সরকার এসব ক্ষেত্রে যারা নাগরিক আইনত তাদের বাধ্যবাধকতা দাবি করতে পারে না; কারণ, কোন মুসলমান যখন 'মন্দ কার্য করতে আদিষ্ট হয় তখন (সে) তা শুনবে না এবং পালন করবে না।'[১০] এই নীতিরই উপর ভিত্তি করে আজকালকার পরিভাষায় যাকে 'বিবেকের আপত্তি' বলা হয় ষোল আনা ন্যায়সঙ্গতভাবেই নাগরিকবৃন্দ তার আশ্রয় নিতে পরে অর্থাৎ নৈতিক দিক দিয়ে গর্হিত কাজে অস্ত্র গ্রহণ করতে তারা অস্বীকার করতে পারে। পক্ষান্তরে বহিঃশত্রু বা অভ্যন্তরীণ শত্রু দ্বারা দেশ আক্রান্ত হলে সে আক্রমণের বিরুদ্ধে মুসলমানকে যদি দেশ রক্ষার জন্য আহবান জানানো হয় তাহলে তার এই ধরনের আপত্তির কোন বৈধ কারণ থাকবে না। কারণ, এটা প্রকৃতই 'আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম' এবং এ ধরনের সংগ্রামে মৃত্যুবরণের অর্থ হচ্ছে শাহাদতের মহান মর্যাদা অর্জন।

ইসলামের শিক্ষানুযায়ী, প্রত্যেক সমর্থ-দেহ মুসলিমই নিজ ধর্মীয় স্বাধীনতা কিংবা নিজ সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক নিরাপত্তা বিপন্ন হলে জিহাদের জন্য অস্ত্র ধারণ করতে বাধ্য। সৈনিকের দায়িত্ব গ্রহণে যে সব মুসলিম দৈহিক দিক দিয়ে অসমর্থ তাদেরকে বেসামরিক পর্যায়ে এবং সামর্থানুযায়ী অর্থ সাহায্যের মাধ্যমে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে হবে। রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথায় ঃ

من جهز غزيا فى سبيل الله فقد غزا - ومن خلف غازيا فى اهله فقد غزا-

'আল্লাহ্‌র পথে যে যুদ্ধ করছে তাকে যে ব্যক্তি অস্ত্র সরবরাহ করে সে প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করছে; এবং কোন যোদ্ধা তার পরিবারকে পশ্চাতে রেখে গেলে যে ব্যক্তি সেই পরিবারের যত্ন নেয়, সে প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করছে।'[১১] পক্ষান্তরে —

ومن لم يغز ولم يجهز غازيا اويخلف فى اهله بخير اصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة-

'যে ব্যক্তি (নিজে) সংগ্রাম করে না, কোন যোদ্ধাকে অস্ত্রে সজ্জিত করে না, অথবা সৈনিক কর্তৃক পশ্চাতে রেখে যাওয়া পরিবার-পরিজনের যত্ন নেয় না, আল্লাহ্ তাহাকে কিয়ামতের আগেই (জীবদ্দশায়ই) দুর্দশাগ্রস্ত করবেন।'[১২] তাই,

১০. আল-বুখারী ও মুসলিম ঃ আদুল্লাহ্ ইবনে উমর বর্ণিত।
১১. আল-বুখারী ও মুসলিম ঃ যায়দ ইবনে খালিদ বর্ণিত।
১২. আবূ দাউদ, আবূ উমামাহ বর্ণিত।

www.pathagar.com

শত্রুকে প্রতিহত করার সংগ্রামে সমাজের প্রতিটি বয়স্ক লোককেই অংশগ্রহণ করতে হবে। রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের কাজ হচ্ছে সকল ব্যক্তিগত প্রয়াসের সমন্বয় সাধন এবং সময়ের চাহিদা অনুযায়ী এসবকে একটি সাধারণ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার রূপ দান।

কিন্তু অমুসলিম নাগরিকদের বেলায় ব্যবস্থা কী? কারণ لا اكراه فى الدين 'ধর্মে কোন জোরজবরদস্তি নেই'[১৩] — আল-কুরআনের এই নীতির আলোকে স্পষ্টতই ইসলামের ধর্মীয় বিধানসমূহ অমুসলিমদের উপর বাধ্যতামূলক হতে পারে না। জবাব সুস্পষ্ট। আল-কুরআনে প্রদত্ত জিহাদের ধারণা — যা শুধু আত্মরক্ষার্থেই যুদ্ধের অনুমতি দেয়, তা যদি নিষ্ঠার সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ অনুসরণ করেন তা হলে রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব — যে রাষ্ট্র তাদের নিরাপত্তা দান করে — স্পষ্টতই অমুসলিম নাগরিকদেরও দায়িত্ব; অধিকন্তু এ কারণেও এটা তাদের দায়িত্ব যে ইসলাম শুধু তাদের বৈষয়িক ব্যাপার-বিষয়াদিরই হিফাজত করে না, তাদের আধ্যাত্মিক স্বাধীনতাও রক্ষা করে।[১৪] এটা সত্য যে, রসূলুল্লাহ (সা) ইসলামের প্রতিরক্ষার্থে যেসব অভিযান পরিচালনা করেছিলেন তাতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য মুসলমানদের হিফাজতে বসবাসকারী অমুসলিমদের (যিম্মীদের) উপর তিনি কখনও চাপ দেন নি; কিন্তু অমুসলিমেরা চাইলে মুসলমানদের পাশাপশি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে পারতো এবং এ ব্যাপারে রসূল (সা)-এর কোন নিষেধাজ্ঞা ছিল না। মুসলমান এবং অমুসলমানের মধ্যে এ ব্যাপারে তফাত এই যে, মুসলমানেরা প্রয়োজন হলে ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধ (এবং শুধু ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধকেই জিহাদ বলা যেতে পারে) তার ধর্মীয় নির্দেশানুযায়ীই তার জীবনদান করতে বাধ্য, অথচ অমুসলিম নাগরিকদেরকে কোন অবস্থায়ই এরূপ কুরবানীর জন্য আহবান করা যায় না। যে রাষ্ট্র অমুসলিমদেরকে পূর্ণ নিরাপত্তা দান করে এবং সকল নাগরিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করে সে রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার্থে অমুসলিম নাগরিকদের একটা বড় অংশ ইচ্ছুক, এমন কি আগ্রহশীল হবে এমন অনুমান করা যায়; তবু ধারণা করা যায় যে, এসব অমুসলিমের কেউ কেউ বিশেষ করে খৃষ্টানেরা অস্ত্রধারণ করাকে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের পরিপন্থী মনে করতে এবং সামরিক বৃত্তি গ্রহণে আপত্তি জানাতে পারেন। এই ধরনের বিবেকী আপত্তিকারীদের ক্ষেত্রেই 'ধর্মে কোন জোরজবরদস্তি নেই' স্বভাবত এই নির্দেশ প্রযোজ্য হবে। তারা সামরিক চাকরি থেকে রেহাই পায় 'জিযিয়া' (যার শাব্দিক মানে হচ্ছে 'ক্ষতিপূরণ কর' — মিলিটারী সার্ভিসের পরিবর্তে) নামক একটা বিশেষ কর আদায়ের মাধ্যমে। এই

১৩. কুরআন, ২ ঃ ৫৬ দেখুন।
১৪. কুরআন, ২২ ঃ ৪০।

www.pathagar.com

করের কোন নির্দিষ্ট হার রসূল (সা) ঠিক করে দেন নি, কিন্তু প্রচলিত সমস্ত হাদীস থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, এর হার মুসলমানদের উপর ধার্য 'যাকাত-করের' চাইতে কম এবং এই যাকাত দান ইসলামের একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় কর্তব্য বলে স্বভাবতই তা অমুসলিমদের উপর ধার্য করা হয় না। শুধুমাত্র সেইসব অমুসলিম, যারা মুসলমান হলে রাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীতে কাজ করবে বলে আশা করা যেতো (এবং তাদের মধ্যে শুধু তারাই যারা আর্থিক দিক দিয়ে সমর্থ) তারাই 'জিযিয়া' আদায় করবে। তাই নিম্নলিখিতরা আইনত 'জিযিয়া' আদায়ের দায়িত্ব থেকে মুক্ত ঃ

(ক) নারীগণ, (খ) যেসব পুরুষ এখনো বয়ঃপ্রাপ্ত হয়নি তারা, (গ) বুড়োরা, (ঘ) রুগ্ন এবং অঙ্গহানির কারণে অসমর্থ ব্যক্তিবর্গ, (ঙ) পুরোহিত এবং সন্ন্যাসীরা এবং (চ) যারা সামরিক বৃত্তি বেছে নেবে এমন সকল লোক।

আনুগত্যের সীমা

জিহাদ এবং সামরিক বৃত্তি সম্পর্কে এই আলোচনার পর এখন ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকদের দায়িত্ব, বিশেষ করে আনুগত্যের প্রশ্নে তাদের দায়িত্ব বিচার করে দেখা যাক।

রাষ্ট্র তার নীতি ও পন্থার দিক দিয়ে শরীয়ার শর্তসমূহ যতক্ষণ পর্যন্ত মেনে চলে, ততক্ষণ সরকারের প্রতি আনুগত্য মুসলিম নাগরিকদের একটা ধর্মীয় কর্তব্য। রসূলুল্লাহ (সা)-এর কথায় —

من خلع يدا من امن طاعة لقى الله يوم القيامة ولاحجة له من مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية-

'যে ব্যক্তি (আমীরের প্রতি) তার আনুগত্যের হস্তকে তুলে নেয় (প্রত্যাহার করে), সে যখন কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত করবে তখন তার নিজের সমর্থনে কিছু পাবে না; এবং যে ব্যক্তি নিজেকে আনুগত্যের শপথে আবদ্ধ মনে না করে (শাব্দিক অর্থে — 'যখন তার ঘাড়ে আনুগত্যের কোন শপথ নেই') মৃত্যুবরণ করে, সে জাহিলিয়তের যামানারই মৃত্যুবরণ করে (অর্থাৎ অবিশ্বাসীরূপেই মারা যায়)।[১৫]

মুসলিম ঐক্যের উপর আল-কুরআন এবং সুন্নাহ্‌র যে গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে সেই গুরুত্বের বিচার এই ঐক্য নষ্ট করার যে কোন চেষ্টা যে শুধু

১৫. মুসলিম, ইবনে উমর বর্ণিত।

www.pathagar.com

সবচেয়ে বড়ো অপরাধই — তা নয়, আসলে মারাত্মক রাষ্ট্রদ্রোহিতা বলেই গণ্য হওয়া উচিত এবং অত্যন্ত কঠোরভাবে তা দণ্ডিত হওয়া কর্তব্য। এ কারণে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

ايما رجل خرج يفرق بين امتى فاضربوا عنقه- من اتاكم وامر كم جميع على رجل واحد يراید يشق عصاكم اويفرق جماعتكم فاقتلوه-

'আমার উম্মতের ঐক্য যে ব্যক্তিই নষ্ট করতে চায়, তারই গর্দানে আঘাত হানো।'[১৬] 'যখন তোমরা কোন এক ব্যক্তির নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ রয়েছো তখন যদি কেউ তোমাদের শক্তি নষ্ট করতে বা ঐক্য ভঙ্গ করতে চায় তাকে হত্যা কর।'[১৭]

যাই হোক, 'আমীর' স্বয়ং যে রাষ্ট্রের প্রতিভূ সে রাষ্ট্রের প্রতি মুসলিমের আনুগত্য শর্তবিহীন নয়। উচ্চতম ক্ষমতার অধিকারী রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিজের দেয়া বিধান অনুসারে আনুগত্যের প্রায় শর্ত হচ্ছে আনুগত্যের অন্তর্নিহিত দায়িত্বগুলো আদায়ে ব্যক্তির ব্যক্তিগত সামর্থ্য। আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর বলেন ঃ

كنا اذا بايعنا رسول الله (صلعم) على السمع والطاعة يقول لنا : "فيما استطعتم"-

'যখনি আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে (তাঁর কথা) শোনার ও মান্য করার প্রতিশ্রুতি দিতাম তিনি আমাদেরকে বলতেনঃ 'অবশ্য তোমাদের সাধ্যমতো।'[১৮] এ অনুমান আমরা নিরাপদেই করতে পারি যে, রসূল (সা) তাঁর অনুসারীদের উপর কখনো অমন দায়িত্ব চাপান নি, যা ছিল তাদের সামর্থ্যের বাইরে। তবে, তাঁর উম্মতের বিধানদাতা হিসাবে তিনি নিঃসন্দেহে সকলকে এ বিষয়ে অবহিত করতে চেয়েছিলেন যে, কোন জাগতিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশ 'শোনা ও পালন করা' কতকগুলো শর্তসাপেক্ষ। কোন নাগরিকের আয়ত্তাতীত কোন অবস্থার কারণে সৃষ্ট দৈহিক অসমার্থ্য এ রকম একটি শর্ত হতে পারে, নৈতিক অসামর্থ্য হতে পারে আরেকটি শর্ত। রসূল (সা) যখন বলেন ঃ

لا طاعة فى معصية انما الطاعة فى المعروف -

'পাপ কাজে আনুগত্যের দায়িত্ব নেই, জেনে রাখো, শুধুমাত্র সৎ কাজের বেলায়ই (ফিল-মারূফ) আনুগত্য।'[১৯] তখন তিনি শেষোক্ত শর্তটির কথাই বলেন।

১৬. আন-নিসায়ী, উসামাহ্ ইবনে বর্ণিত।
১৭. মুসলিম, আরফাজাহ্ বর্ণিত।
১৮. আল-বুখারী ও মুসলিম, ইবনে উমর বর্ণিত।
১৯. আল-বুখারী ও মুসলিম, আলী বর্ণিত।

www.pathagar.com

এই হাদীসটির অন্যান্য পাঠে রসূলুল্লাহ (সা) নিম্নলিখিত রূপ বলেছেন বলে বলা হয়ে থাকে ঃ

لاطاعة لمن لم يطع الله -

'আল্লাহ্‌র প্রতি যে অনুগত নয় তার প্রতি আনুগত্য নেই।'[২০]

لاطاعة لمن عصى الله تعالى -

'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণ করে তার প্রতি আনুগত্য নেই।'[২১]

এ সবেরই স্বাভাবিক পূর্বানুমান এই যে, সরকারের ক্রিয়াকলাপের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার এবং যে কোন প্রশাসনিক ও আইন প্রণয়নমূলক নীতির সমালোচনা করার অধিকতর দায়িত্ব রয়েছে নাগরিকদের — যদি তাদের আশংকা হয় যে ঐ সব ব্যাপার ঠিকমতো চলছে না। এ মর্মে আল-কুরআনের বহু আয়াত ও রসূল (সা)-এর বহু হাদীস রয়েছে যে, প্রকাশ্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে — বিশেষ করে অন্যায়কারী যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, তখন উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ করা মুসলমানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কর্তব্য। আল্লাহ্‌র রসূল তাই বলেছেন ঃ

افضل الجهاذ من قال كلمة الحق عند سلطان جائر-

'সরকার (সুলতান) যখন সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয় তখন সামনা সামনি সত্য বলা সর্বোত্তম জিহাদ।'[২২] এবং

من راى منكم منكر افليغيره فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه- ذالك اضعف الايمان-

'তোমাদের কেউ যদি খারাপ কিছু দেখে তার উচিত তার নিজ হাতে তা সংশোধন করা; এবং এতে সে অসমর্থ হলে তার জিহ্‌বার দ্বারা; এবং সে যদি তাতেও অসমর্থ হয়, তখন তার অন্তর দ্বারা, কিন্তু এ হচ্ছে সবচেয়ে দুর্বল ঈমানের পরিচয়।'[২৩]

অন্য কথায়, হস্ত দ্বারা অন্যায়ের প্রতিকারকে রসূলুল্লাহ্ (সা) সর্বোচ্চ ঈমানের পরিচয় বলে গণ্য করেছেন; অবিচারী সরকারের প্রতি নাগরিকদের মনোভাব কি হওয়া উচিত, সে প্রশ্নে এই নীতিটি প্রযোজ্য।

---

২০. আহমদ ইবনে হাম্বল, মুয়াদ ইবনে হাম্বল বর্ণিত।
২১. আহমদ ইবনে হাম্বল, উবাদাহ্ ইবনে আসসামিত বর্ণিত।
২২. আবূ দাউদ, আত্-তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। আবূ সাঈদ আল-খুদরী বর্ণিত।
২৩. মুসলিম, আবূ সাঈদ আল-খুদরী বর্ণিত।

www.pathagar.com

কিন্তু রসূল (সা)-এর কথার তাৎপর্য কি এই, যে যখনি সরকার শরীয়ার কোন আইনের বরখেলাফ কিছু করবে তখনি তার বিদ্রোহাচরণে অধিকার নাগরিকদের রয়েছে? স্পষ্টতই নয়; কারণ রসূল (সা)-এর নির্দেশ এই ঃ

من بايع اما ما فاعطاه صفته يده وثرة قلبه فليطعه ان استطاع-

'সে ব্যক্তি — যে তার হাত ও অন্তরের ফল দ্বারা কোন নেতার (ইমামের) প্রতি আনুগত্যের শপথ নিয়েছে সে তাকে মান্য করে চলবে যদি (অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত) সে তা পারে।'[২৪] অর্থাৎ ততক্ষণ মেনে চলবে যতক্ষণ আমীর সাধারণভাবে ইসলামের মূল্যগুলোকে মেনে চলেন এবং ইচ্ছাকৃতভাবে ইসলামের লক্ষ্য ও উদ্দিষ্টকে বর্জন করেন না। আমীরের সাময়িক কোন ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে নাগরিকেরা তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অধিকারী নয় — নিদেনপক্ষে ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ না সমাজের সংখ্যাগুরু অংশ তাঁর বিরুদ্ধে নিজেদের বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

من رأى اميره شيئا فكره فليصبر- فانه ليس احد يفارق الجماعة فيموت الا مات ميتة جاهلية-

'যদি কেউ 'আমীরের' মধ্যে এমন কিছু দেখতে পায় যা তাকে পীড়া দেয় (তবু) তার উচিত ধৈর্য ধারণ করা; কারণ স্মরণ করো ঐক্যবদ্ধ জামায়াত থেকে যে নিজেকে হস্ত পরিমাণও দূরে রাখে এবং সেভাবেই মারা যায়, সে জাহিলিয়ার যামানার মৃত্যুই বরণ করলো।'[২৫]

তা হলে, নাগরিকেরা অবিচারী শাসকের প্রতি কতক্ষণ এবং কী পর্যন্ত এই সহিষ্ণুতা দেখাবে? এ প্রশ্নের জবাব কয়েকটি বিশ্বস্ত হাদীস থেকে, বিশেষ করে নিম্নোদ্ধৃত দুটো হাদীস থেকে পাওয়া যাচ্ছে। হাদীস দুটো এক সঙ্গে পড়তে হবে। রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ

وقال رسول (صلعم) خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم شرار ائمتكم الذين ينغضونهم ينغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم- قلنا رسول الله - فلا تنابذهم عند ذالك ؟ قال لا ما قاموا فيكم الصلواة لاما اقامو فيكم الصلواة-

২৪. মুসলিম আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর বর্ণিত।
২৫. আল-বুখারী ও মুসলিম, আবদুল্লাহ্ ইবনে আববাস বর্ণিত।

www.pathagar.com

'তোমাদের সর্বোত্তম নেতা হচ্ছে তারাই, যাদেরকে তোমরা ভালোবাসো এবং যারা তোমাদেরকে ভালোবাসে, যাদের জন্য তোমরা আশীর্বাদ কামনা করো, এবং যারা তোমাদের জন্য আশীর্বাদ কামনা করে; এবং তারাই হচ্ছে তোমাদের নিকৃষ্টতম নেতা তোমরা যাদেরকে ঘৃণা করো এবং যারা তোমাদেরকে ঘৃণা করে, যাদেরকে তোমরা অভিশাপ দাও এবং যারা তোমাদেরকে অভিশাপ দেয়।' আমরা (অর্থাৎ রসূলের সাহাবিগণ) জিজ্ঞাসা করলাম, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! অবস্থা যদি এমন হয় — আমাদের কি উচিত নয় তাদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করা?' তিনি বললেনঃ 'না, যতক্ষণ তারা তোমাদের মধ্যে সালাত কায়েম করে — না, যতক্ষণ তারা তোমাদের মধ্যে সালাত কায়েম করে।'[২৬]

বলা বাহুল্য, এখানে 'সালাত কায়েম করা' শুধুমাত্র জামাআতে সালাত আদায় করা অপেক্ষা অনেক বেশি ব্যাপক অর্থবোধক। এতে বোঝায় — যেমন পাওয়া যাচ্ছে আল-কুরআনের দ্বিতীয় সূরার শুরুতেই[২৭] — ধর্ম প্রতিষ্ঠার ইতিবাচক নির্দেশ।

সাহাবা 'উবাদা ইবনে আস-সামিত' বর্ণিত অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছেঃ

دعانا النبى (صلم) فبايعناه فقال فيما اخذ علينا ان بايعنا على السمع والطاعة فى منشطنا ومكرهنا وعسرنا يسرنا واثرة علينا وان لاتنازع الا والامر اهله "الاتروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان-

'নবী আমাদের ডাকলেন এবং আমরা তাঁর নিকট আনুগত্যের শপথ নিলাম। তিনি আমাদেরকে আমাদের ব্যক্তিগত পছন্দ যাই হোক না সংকটে এবং সুখে-আমাদের জন্য আনন্দজনকই হোক অথবা বিরক্তিকরই হোক, শোনা ও মেনে চলার দায়িত্ব দিলেন এবং (আমাদের বুঝিয়ে বললেন) যাদেরকে কর্তৃত্ব দান করা হয়েছে তাদের কাছ থেকে তা ফিরিয়ে নেয়া আমাদের উচিত নয়, যদি না তোমরা প্রকাশ্য সত্য প্রত্যাখ্যান (কুফর) দেখতে পাও — যে ব্যাপারে তোমরা আল্লাহ্‌র (কিতাব থেকে) স্পষ্ট প্রমাণ পাচ্ছো।'[২৮]

---

২৬. মুসলিম, আউফ ইবনে মালিক আল-আওযায়ী বর্ণিত।

২৭. কুরআন, ২ ঃ ৩

২৮. আল-বুখারী, উবাদা ইবনে আস-সামিত বর্ণিত। মুসলিমও প্রায় একই রকম একটি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

www.pathagar.com

এ সম্পর্কিত সব কটি সহীহ্ হাদীসের প্রসঙ্গ থেকে চারটি মূলনীতি স্বতঃ-প্রমাণিত (১) যতক্ষণ 'আমীর' আইনত প্রতিষ্ঠিত সরকারের প্রতিনিধিত্ব করছেন, ততক্ষণ জনসাধারণের একে বা অপরে ব্যক্তি আমীরকে এবং কখনো কখনো তাঁর প্রশাসনিক কোন কর্মকেও যতই অপছন্দ করুক না কেন, সকল নাগরিকই 'আমীরের' প্রতি অনুগত থাকতে বাধ্য; (২) যদি সরকার এমন কোন আইন বা বিধান জারি করে, যা প্রকৃত 'শরয়ী' অর্থে পাপ-কর্ম বলে গণ্য হয়, তা হলে এইসব আইন বা বিধানের ক্ষেত্রে আনুগত্যের দায়িত্ব আর থাকে না; (৩) সরকার যদি প্রকাশ্যে ও ইচ্ছাকৃতভাবে আল-কুরআনের 'নস্' নির্দেশসমূহের বিরুদ্ধে কাজ করতে সংকল্প করে তা হলে সে সত্য-প্রত্যাখ্যানের অপরাধে অপরাধী বলে গণ্য হবে এবং এ কারণে কর্তৃত্ব তার নিকট থেকে কেড়ে নিতে হবে এবং (৪) এই কর্তৃত্ব ফিরিয়ে নেয়ার কাজটি সমাজের সংখ্যালঘু একটা অংশ কর্তৃক সশস্ত্র বিদ্রোহের মারফত সম্পন্ন হবে না; কারণ নবী করীম (সা) সতর্ক করে দিয়েছেনঃ

من حمل علينا السلاح فليس منا-

'যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে হাত তোলে সে আর আমাদের একজন থাকে না (অর্থাৎ মুসলিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত থাকে না)।'[২৯]

من سل علينا السيف فليس منا-

'এবং যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে তার তরবারি উত্তোলন করে সে আর আমাদের একজন থাকে না।'[৩০]

সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে সরকারের 'শরীয়া' বিরোধী নির্দেশসমূহ অমান্য করার ও সরকারের আচরণ সরাসরি সত্য প্রত্যাখ্যান পর্যায়ে গেলে সে সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার ক্ষমতা রসূলুল্লাহ (সা) মুসলমানদেরকে দিয়েছেন। যাই হোক, আল-কুরআন এবং সুন্নাহ্ যে সামাজিক ঐক্য নীতির উপর এতো ঘন ঘন তাকীদ দিয়েছে, সেই নীতিরই পরিপ্রেক্ষিতে বলতে হয়; কোন পর্যায়ে এসে আমীরের প্রতি আনুগত্য আর ধর্মীয় এবং নাগরিক কর্তব্য থাকে না, তা সম্ভবত ব্যক্তিগতভাবে একেকজন নাগরিকের বিচার-বিবেচনার উপর ছেড়ে দেয়া যেতে পারে না। এ ধরনের সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র সমগ্র সমাজ কর্তৃক বা সমাজের যথোচিতভাবে নিযুক্ত প্রতিনিধিবর্গ কর্তৃকই গৃহীত হতে পারে। কেউ কেউ ধারণা করতে পারেন ঃ এমন ক্ষেত্রে মজলিস আশ-শূরাই হবে সত্যিকার

২৯. আল-বুখারী ও মুসলিম, আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর ও আবূ হুরায়রা বর্ণিত।
৩০. মুসলিম, সালামা ইবনে আল-আওফা বর্ণিত।

www.pathagar.com

ক্ষমতাসম্পন্ন; কিন্তু এর বিরুদ্ধে আমাদের এই আবিষ্কার রয়েছে যে নিরপেক্ষ কোন ট্রাইবুনাল অর্থাৎ সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ট্রাইবুনালের শরণ না নিলে আমীর এবং মজলিসের মধ্যে মতদ্বৈধ অসমাধ্য অবচলাবস্থার কারণ হতে পারে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমি বলেছি — কোন আইন বা প্রশাসনিক কোন বিধি-নির্দেশ শরীয়ার বিরোধী হলে তাকে বাতিল বলে ঘোষণা করাই হবে এই ট্রাইবুনালের কর্তব্য। একইভাবে, আমীর (ইচ্ছাকৃতভাবে) ইসলামী আইনের বিরুদ্ধ পন্থায় দেশ শাসন করছেন — আমীরের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ আনীত হলে আমীরকে তার পদ থেকে অপসারণের প্রশ্নটি সম্পর্কে সমগ্র সমাজের মতামত আহবানের ক্ষমতা এই ট্রাইবুনালেরই আওতায় পড়বে। যদি এই ধরনের মতামত আহবানের মাধ্যমে দেখা যায় সমাজের বেশির ভাগ লোক আমীরের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করেছেন তখন ধরে নিতে হবে যে তিনি আইনত তাঁর পদ থেকে অপসারিত হয়েছেন এবং সে কারণে তাঁর প্রতি জনগণের আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি আর কার্যকরী থাকবে না।

তাই, সরকারের কার্যকলাপের উপর সতর্ক নজর রাখা সম্বন্ধে নাগরিকদের যে কর্তব্য রয়েছে এবং সরকারের সমালোচনার এবং চূড়ান্ত অবস্থায় ক্ষমতাচ্যুত করার যে অধিকার তাদের রয়েছে তাকে বিশেষ কোন ব্যক্তি বা কতিপয় ব্যক্তির একটা দলের বিদ্রোহের অধিকারের (যার অস্তিত্ব নেই) সঙ্গে অভিন্ন মনে করা কিছুতেই উচিত হবে না। শুধুমাত্র সমাজের সংখ্যাগুরু অংশের প্রকাশ্য রায়ের জোরেই সম্ভব হলে শান্তিপূর্ণ উপায়ে এবং প্রয়োজনবোধে বলপ্রয়োগে, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কোন মুসলমান সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা যেতে পারে।

মতের স্বাধীনতা

অবশ্য কোন সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা উচিত কিনা, শুধু যে এই প্রশ্নেই (সম্ভবত খুব কুচিতই উত্থাপিত হতে পারে) নিজের বিচার-বুদ্ধির প্রয়োগ করতে এবং সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ানোর জন্য নৈতিক সাহসের পরিচয় দিতে মুসলিম নাগরিক বাধ্য তা নয়; কারণ আল-কুরআনের শিক্ষা অনুসারে, সে যেখানেই পাপ-অমঙ্গলের সম্মুখীন হোক না কেন, তা প্রতিরোধ করা এবং যখনি মানুষ ন্যায়-নীতিকে অশ্রদ্ধা করে তখন তার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়াস চালিয়ে যাওয়া তার অবশ্য কর্তব্য। নবী করীম (সা) বলেন ঃ

والذى نفسى بيده لتامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر او ليوشكن الله ان يبعث عليكم عذابا من عنده ثم لتذ عنه ولا يستجاب لكم-

'যাঁর হাতে আমার আশ্রয় তাঁর শপথ! তোমরা অবশ্যই ভালোর নির্দেশ দেবে এবং মন্দ নিষেধ করবে; অন্যথায় আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তোমাদের উপর শাস্তি নাযিল

www.pathagar.com

করবেন; তখন তোমরা তাকে ডাকবে, কিন্তু তিনি তোমাদের প্রতি সাড়া দেবেন না।'[৩১]

এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌র শাস্তি যে সকল সময় শুধু কর্তব্যে উদাসীন ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে তা না-ও হতে পারে; বরং রসূল যেমন বলেছেন, গোটা জাতির ভাগ্যের উপরই এর ক্রিয়া হতে পারে ঃ

كلا والله لتامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ولتاخذن على يدى الظالم ولتاطونه على الحق اطواً ولتقصرنه على الحق قصرا اوليضبن الله قلوب بعضكم على بعض-

'না, আল্লাহ্‌র শপথ — তোমরা অবশ্যই ভালোর নির্দেশ দেবে এবং মন্দ নিষেধ করবে এবং তোমরা অবশ্যই জালিমের হস্ত নিরস্ত করবে, ন্যায়নীতির (আল-হক) প্রতি তাকে বিনত করবে এবং ন্যায়াচরণে তাকে বাধ্য করবে; অন্যথায় আল্লাহ্ তোমাদের সকলের হৃদয়কে একে অন্যের বিরুদ্ধে স্থাপন করবেন।'[৩২]

اذا راوا الظالم فلم ياخذوا على يد يه اوشك ان يعمهم الله بعقابه-

'এবং মানুষ যদি কোন অত্যাচারীকে দেখে আর তার হস্ত নিরস্ত না করে, তা হলে, খুব সম্ভব আল্লাহ্ তাঁর শাস্তির দ্বারা বেষ্টন করবেন।'[৩৩] একই হাদীসের অন্য এক পাঠে রসূল (সা) নিম্নোক্ত রূপ বলেছেন বলে কথিত ঃ

. ما من قوم يعمل فيهم المعاصى ثم يقدرون على ان يغيروا ثم لا يغيرون الا يوشك ان يعمهم الله بعقاب-

'যে সমাজের মধ্যে মন্দ কাজ অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে — যা সমাজ কর্তৃক সংশোধিত হতে পারতো অথচ সংশোধিত হলো না, সে সমাজ সমগ্রভাবে আল্লাহ্‌র শাস্তিগ্রস্ত হওয়ার খুবই আশংকা।'[৩৪] তাই, সমগ্র সমাজের স্বার্থেই, সমাজের প্রত্যেকটি লোকের উচিত যখনি এবং যেখানেই সম্ভব, সামাজিক এবং নৈতিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রয়াস চালিয়ে যাওয়া; কারণ —

---

৩১. আত্-তিরমিযী হুযায়ফা বর্ণিত।
৩২. আবূ দাউদ, আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসূদ বর্ণিত।
৩৩. আবূ দাউদ, আবূ বকর বর্ণিত।
৩৪. আবূ দাউদ, আবূ বকর বর্ণিত।

www.pathagar.com

ان الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم-

'জেনে রাখো, আল্লাহ্ কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা তাদের অন্তরের মধ্যে পরিবর্তন আনয়ন করে।'[৩৫] মনে রাখা দরকার যে, কোন জাতির নৈতিক-মনোভঙ্গী ও তার বাহ্য অবস্থার মধ্যে এই যে পরস্পর নির্ভরশীলতা — তার ক্রিয়া দ্বিমুখীঃ জাতির নৈতিক কাঠামোর উৎকর্ষের ফলে পরিণামে যেমন বৃহত্তর বৈষয়িক সমৃদ্ধি ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আসতে বাধ্য তেমনি নৈতিক পতনের অনিবার্য পরিণাম হচ্ছে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবক্ষয়।

যে কোন বাস্তব পরিবর্তন অর্থাৎ নৈতিক ও সামাজিক উন্নতিমুখী যে কোন পরিবর্তন শুধু তখনই আসতে পারে, যখন সমাজ এ পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। এ কারণে, প্রত্যেক চিন্তাশীল মুসলিমের কর্তব্য হচ্ছে তার সামাজিক পরিবেশকে কঠোর নিরবচ্ছিন্ন সমালোচনার অধীনে রাখা এবং সর্বসাধারণের জন্য উচ্চকণ্ঠে এই সমালোচনা করা।

রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

لاحسد الا فى أثنين : رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته فى الحق

ورجل اتاه الله المحكمة فهو يقضى بها يعلمها-

'শুধুমাত্র দু' ব্যক্তিই (দুই রকম) যথার্থ ঈর্ষার পাত্র-যে ব্যক্তিকে আল্লাহ্ ধন দিয়েছেন এবং তৎপর ন্যায়ের পথে তা বিলিয়ে দেবার ক্ষমতা দিয়েছেন এবং যে ব্যক্তিকে আল্লাহ্ প্রজ্ঞা দিয়েছেন এবং যে এর মর্মানুসারে কাজ করে এবং (অন্যকে) শিক্ষা দেয়।'[৩৬]

সুতরাং সমালোচনা করা ও পরামর্শ দানের দায়িত্ব — ইসলামী অর্থে নাগরিক চেতনার সুস্থ বিকাশের জন্য যা এতো প্রয়োজনীয় — সেই দায়িত্ব পালন দ্বারাই সমাজের প্রতি ব্যক্তির সকল আদর্শিক বাধ্যবাধকতা শেষ হয়ে যায় না। আমরা দেখেছি, আল-কুরআন এবং সুন্নাহ্র অপরিবর্তনীয় স্বতঃপ্রমাণ নস্-নির্দেশমালায় যেসব ব্যাপার সম্পর্কে কোন আইন বিধিবদ্ধ নেই, সেসব ব্যাপারে সত্যিকার ইসলামী সমাজ অবিরাম ইজতিহাদের প্রয়োজনীয়তা পূর্বাহ্নেই স্বীকার করে নেয় এবং এর আবশ্যকতার উপর জোর দিয়ে থাকে। আর যখনি সমগ্র সমাজের সঙ্গে সম্পর্কিত কোন ব্যাপার আলোচিত হয়, তখনি ইজতিহাদের এই স্বাধীনতা নৈতিক এবং সামাজিক দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়। অন্য

৩৫. আবূ দাউদ, আবূ বকর বর্ণিত।
৩৬. আল-বুখারী ও মুসলিম, ইবনে মাসুদ বর্ণিত।

www.pathagar.com

কথায় সমাজের বুদ্ধিজীবী নেতৃবৃন্দের নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে সমাজের প্রগতি সম্পর্কে তাদের সকল নতুন ভাব-চিন্তাকে উপস্থাপিত করা এবং প্রকাশ্যে জনসাধারণের মধ্যে সেসব ভাব-চিন্তার সমর্থনে যুক্তিতর্ক পেশ করা। এ কারণে নিজের অভিমতকে কথা এবং লেখার মাধ্যমে প্রকাশ করার অধিকার ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকদের একটি মৌলিক অধিকার। অবশ্য একথা অনুধাবন করতে হবে যে, মতের এই স্বাধীনতা ও তার প্রকাশকে (যার মধ্যে স্বভাবতই সংবাদপত্রের স্বাধীনতাও পড়ে) কিছুতেই আইনের বিরুদ্ধে উস্কানি দেয়ার কিংবা প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সৃষ্টির জন্য ব্যবহার করা চলবে না এবং সাধারণ সৌজন্যের বরখেলাফ কিছুতে প্রয়োগ করা যাবে না।

নাগরিকদের রক্ষণাবেক্ষণ

আমরা দেখিয়েছি, নিজের ব্যক্তিস্বার্থকে সমগ্রভাবে সর্বদা সমাজের স্বার্থের নিচে স্থান দিতে মুসলমান শুধু আইনতই নয়, নৈতিকতার দিক দিয়েও বাধ্য; এই বাধ্যবাধকতার উৎস এই নীতি যে এ ধরনের রাষ্ট্র 'পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র খলীফা বা প্রতিনিধি'। অবশ্যি এটা সুস্পষ্ট যে নাগরিকদের আনুগত্যের প্রতি রাষ্ট্রের ধর্মীয় দাবি কিছুতেই এক পক্ষের ব্যাপার হতে পারে না; অর্থাৎ রাষ্ট্র এবং নাগরিকের মধ্যকার সম্পর্ক নাগরিকের উপর আরোপিত বাধ্যবাধকতার মধ্যে এমন কি রাষ্ট্র কর্তৃক তাকে প্রদত্ত কতিপয় স্বাধীনতা — যেমন, মতের স্বাধীনতা ও তা প্রকাশের স্বাধীনতা, ভোট দিয়ে সরকারকে ক্ষমতাসীন করার ও তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার অধিকার ইত্যাদির মধ্যে সীমিত হতে পারে না; নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্রের কতিপয় স্পষ্ট বিবৃত বাস্তব ও বাধ্যবাধকতামূলক দায়িত্বের (Positive obligations) রূপে তা প্রতিফলিত হওয়া চাই।

সৈনিকের দায়িত্ব পালনে মুসলিম নাগরিকের যে কর্তব্য তারই অনুরূপ কর্তব্য হচ্ছে বহিশত্রু ও আভ্যন্তরীণ শত্রুর হামলা থেকে নাগরিকদেরকে রক্ষা করার রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। একইভাবে, বিধিমত প্রতিষ্ঠিত সরকারকে মান্য ও সম্মান করার যে দায়িত্ব প্রত্যেকটি নাগরিকের রয়েছে, তার বিনিময়ে সরকারের অবশ্যকরণীয় কর্তব্য হচ্ছে নাগরিকদের ব্যক্তিগত জীবন রক্ষা করা। রসূল করীম (সা) ইসলামের সাধারণ শিক্ষানুযায়ী বিদায় হজ্জ উপলক্ষে আরাফাতের ময়দানে ঘোষণা করেছিলেন ঃ

ان دماء كم واموا لكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا-

www.pathagar.com

'জেনে রাখো, তোমাদের জীবন এবং তোমাদের ধন-সম্পদ তোমাদের নিকট তেমনি পবিত্র যেমন পবিত্র আজকের এই দিন।'[৩৭] অন্য এক সময় তিনি বলেছিলেন ঃ

كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه-

'প্রত্যেক মুসলিমের রক্ত, সম্পদ এবং সম্মান (অন্য) প্রত্যেক মুসলিমের নিকট অবশ্যই পবিত্র।'[৩৮] আল-কুরআন এবং সুন্নাহর এই ধরনের বহু নির্দেশসহ এই ঘোষণাগুলোতে ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধানে এ মর্মে একটি ধারা সন্নিবেশিত করার তাকীদ রয়েছে যে নাগরিকদের জীবন, দেহ এবং ধন-সম্পদ পবিত্র (inviolable) এবং যথারীতি আইনের সাহায্য গ্রহণ ব্যতিরেকে কাউকেই তার জীবন, স্বাধীনতা অথবা সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা চলবে না।

সরকার প্রদত্ত এই নিরাপত্তা নাগরিকদের জীবনের প্রত্যক্ষ দিকসমূহে যেমন তাদের দেহ এবং ধন-সম্পদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না, বরং এ নিরাপত্তা দান করতে হবে তাদের মর্যাদা, সম্মান এবং পারিবারিক জীবনের গোপনীয়তার প্রতিও। আল-কুরআন বলেন ঃ

ويل لكل همزةلزة

'প্রত্যেক বদনাম রটনাকারী মানহানিকারকের উপর অভিশাপ।'[৩৯]

يايها الذين امنوا اجتنبوا اكثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسوا ولا يغتب بعضكم بعضا-

'হে বিশ্বাসিগণ! সন্দেহ যথাসাধ্য এড়িয়ে চলো, কারণ জেনে রাখো, সন্দেহ কখনো কখনো পাপ বিশেষ এবং একে অন্যের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করো না এবং অসাক্ষাতে একে অন্যের অপবাদ রটিও না।'[৪০] এই মনোভাব নিয়েই রসূল করীম (সা) তাঁর উম্মতদেরকে নসীহত করেছিলেনঃ

واياكم والظن مان الظن اكد الحديث ولا تجسوا ولا توذوا المسلمين ولا تعير وا ولا تبعوا عوراتهم فانه من يتبع عورة اخيه المسلم يتبعه الله عورته -

৩৭. মুসলিম, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ বর্ণিত।
৩৮. মুসলিম, আবূ হুরায়রা বর্ণিত।
৩৯. কুরআন, ১০৪ ঃ ১।
৪০. কুরআন, ৪৯ ঃ ১২।

www.pathagar.com

'সন্দেহ সম্পর্কে সতর্ক হও, কারণ ডাহা মিথ্যা তথ্যের উপর সন্দেহের ভিত্তি হতে পারে এবং একে অন্যের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করো না এবং একে অন্যের গোপনীয় দুর্বলতাগুলো প্রকাশ করে দিও না।'[৪১] 'অন্য মুসলমানদের ক্ষতি করো না, তাদের প্রতি মন্দ কিছু আরোপ করো না এবং তাদের নগ্নতাকে উদ্‌ঘাটিত করে দিও না; কারণ জেনে রাখো, কেউ যদি তার মুসলিম ভ্রাতার নগ্নতাকে প্রকাশ করে দেবার চেষ্টা করে, আল্লাহ্ তার নগ্নতাকে প্রকাশ করে দেবেন।'[৪২] এবং শেষ কথা —

ان الا مير اذا ابتغى الريبة فى الناس افسد هم -

'আমীর যদি তাঁর দেশের লোকদেরকে সন্দেহ করতে শুরু করেন তাহলে তিনিই তাদেরকে অসৎ করে তুলবেন।'[৪৩]

আল-কুরআনের আয়াত ঃ

يا يها الذين امنوا لاتد خلوا بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها -

'হে বিশ্বাসিগণ! অনুমতি না নিয়ে এবং গৃহের বাসিন্দাদেরকে সালাম না জানিয়ে তোমরা নিজের গৃহ ছাড়া অন্য কারো ঘরে প্রবেশ করো না।'[৪৪] এর সঙ্গে ঐ সমস্ত হাদীস থেকে শাসনতন্ত্রে এমন একটি বিধান বিধিবদ্ধ করার নির্দেশ মেলে যা প্রত্যেকটি নাগরিকের গৃহে ব্যক্তিগত জীবন এবং সম্মানের পবিত্রতার নিশ্চয়তা বিধান করবে এবং এই মৌলিক অধিকারের বিরোধী হতে পারে এমন কার্যকলাপ থেকে সরকারকে বারণ করবে। তাই সত্যিকার ইসলামী সমাজে ইতিপূর্বে গুরুতর অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তি ছাড়া অন্য যে কোন নাগরিকের জীবন বা কার্যকলাপ সম্পর্কে গোপনীয় পুলিশী তদারককার্য সম্পূর্ণ বিধিবহির্ভূত হবে, শুধুমাত্র সন্দেহবশে কাউকে গ্রেফতার করলে তা হবে শাসনতন্ত্রের বিধান লংঘন করা এবং যথাবিধি স্থাপিত আদালত কর্তৃক পূর্বাহ্নে বিচার এবং শাস্তিদান ছাড়া কাউকে কয়েদ করলে বা হাজতে রাখলে মানবদেহের পবিত্রতা সম্পর্কিত আল-কুরআন ও সুন্নাহ্‌র চূড়ান্ত ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বিধিবদ্ধ মৌলিক নীতিরই সুস্পষ্ট লংঘন হবে।

---

৪১. মালিক ইবনে আনাস আবূ হুরায়রা বর্ণিত।
৪২. আল-বুখারীও প্রায় একই ধরনের ভাষায় উদ্ধৃতি দিয়েছেন।
৪৩. আবূ দাউদঃ আবূ উমামা বর্ণিত।
৪৪. আল-কুরআন ঃ ৪২ ঃ ২৭।

www.pathagar.com

অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা

সরকারের কার্যকলাপের উপর ন্যায়সঙ্গত সতর্ক নজর রাখার যে কর্তব্য নাগরিকদের রয়েছে তারই যুক্তিসঙ্গত পরিণাম হচ্ছে সমাজের সকল প্রাপ্তবয়স্ক লোকের প্রতি ইসলামের প্রদত্ত মতের স্বাধীনতা ও তা প্রকাশের স্বাধীনতা। কিন্তু অবাধে মত প্রকাশের কর্তব্য ও অধিকার অর্থহীন হতে পারে এবং কখনো কখনো সমাজের মহত্তম স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে, যদি না সুষ্ঠু চিন্তার ভিত্তিতে এই সব মতামত প্রদত্ত হয়; বলা বাহুল্য, সুষ্ঠু চিন্তার জন্য আবার প্রয়োজন সুষ্ঠু জ্ঞানের অধিকার। এ কারণে, এ হচ্ছে নাগরিকদের অধিকার এবং রাষ্ট্রের কর্তব্য হল এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করা যা রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি নর-নারীর জন্য জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করে দেবে। আল-কুরআন এবং সুন্নাহ উভয়ই জ্ঞানার্জন সম্পর্কিত নির্দেশে পরিপূর্ণ এবং নবী করীম (সা) অসংখ্যবার জ্ঞানের মহামূল্যতার উপর জোর দিয়েছেন; যেমন —

من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة-

ان فضل العالم على الا بد كفضل القمر يلة البدر على سائر الكواكب -

'যদি কেউ জ্ঞানের সন্ধানে পথে বেরোয়, আল্লাহ তার ফলে, তার জন্য বেহেশ্‌তের পথ সহজ করে দেবেন।'[৪৫]

'যে ব্যক্তি শুধু ইবাদতকারী, তাঁর উপর জ্ঞানীর শ্রেষ্ঠত্ব হচ্ছে সমস্ত তারকার উপর পূর্ণ চন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব সদৃশ।'[৪৬]

আরো এগিয়ে তিনি বলেছেন ঃ

فضل العالم على العا بد كفضلى على ادناكم-

'যে (শুধুমাত্র) ইবাদতকারী তার উপর জ্ঞানীর শ্রেষ্ঠত্ব তোমাদের মধ্যে যে তুচ্ছতম তার উপর আমার শ্রেষ্ঠত্বর অনুরূপ।'[৪৭] এবং সর্বশেষে

طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة-

'জ্ঞানানুসন্ধান প্রত্যেক মুসলিম নর এবং নারীর জন্য 'ফরয' বা অবশ্য কর্তব্য।'[৪৮]

---

৪৫. মুসলিম, আবূ হুরায়রা বর্ণিত।
৪৬. আত্-তিরমিযী, আবূ দাউদ ও আহমদ ইবনে হাম্বল, আবূদ্‌দারদা বর্ণিত।
৪৭. আত্-তিরমিযী, আবূ উমামা আল বাহিলী বর্ণিত।
৪৮. ইবনে মাজাহ্, আনাস বর্ণিত।

www.pathagar.com

তাই এর অনুসিদ্ধান্ত এই যে, যে রাষ্ট্রের অস্তিত্বের যৌক্তিকতা হচ্ছে ইসলামের প্রতি আহবান এবং যে রাষ্ট্র ইসলামের আইনকে দেশের আইনরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তার কর্তব্য সকল মুসলমান নর-নারীর জন্য শিক্ষা শুধু সুগম-সুলভ করাই নয়, বাধ্যতামূলক করাও এবং যেহেতু এ ধরনের রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক মতবাদ হচ্ছে অমুসলিম নাগরিকদেরকেও সমুদয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান, সে কারণে ধর্ম-নির্বিশেষে, সকল নাগরিকের জন্য শিক্ষাকে করতে হবে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক।

অর্থনৈতিক নিরাপত্তা

শেষ কথা, নাগরিকদের আনুগত্য দাবির যৌক্তিকতা পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য রাষ্ট্রকে অবশ্যই নাগরিকদের বৈষয়িক বা জাগতিক কল্যাণের বিধানের সক্রিয় দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। অন্য কথায়, মানবোচিত সুখ-শান্তি ও মর্যাদা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধাদির ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। এই নীতির দৃষ্টান্ত হিসাবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিম্নোক্ত হাদীসের চাইতে স্পষ্টতর আর কিছু হতে পারে না ঃ

الا كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته- فالامام الذى على الناس راع هو مسؤل عن رعيته والرجل راغ على اهل بيته وهو مسؤل عن رعيته والمرأة راعية على اهل بيت زوجها و ولده وهى مسؤ لة عنهم وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤل عنه الا فكلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته -

'জেনে রাখো, তোমাদের প্রত্যেকেই এক এক জন রাখাল এবং প্রত্যেকেই তার নিজের পালের জন্য দায়ী। তাই, জনসাধারণের উপর স্থাপিত ইমাম (অর্থাৎ সরকার) একটি রাখাল (বিশেষ) এবং সে তার নিজের পালের জন্য দায়ী; এবং প্রত্যেক পুরুষই তার পরিবারের রাখাল (স্বরূপ) এবং তার পালের জন্য সে দায়ী; এবং নারী তার স্বামীর ঘর-সংসার ও সন্তান-সন্ততির রাখাল (স্বরূপ) এবং তাদের জন্য সে দায়ী; এবং ভৃত্য তার প্রভুর সম্পত্তির রাখাল (স্বরূপ) এবং তার জন্য সে দায়ী। জেনে রাখো, তোমাদের প্রত্যেকেই একেক জন রাখাল এবং প্রত্যেকেই তার নিজের পালের জন্য দায়ী।'[৪৯]

৪৯. আল্-বুখারী ও মুসলিম ঃ আবদুল্লাহ ইবনে উমর বর্ণিত।

www.pathagar.com

উক্ত হাদীসে এ ব্যাপারটি পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়ার কথা নয় যে, নাগরিকদের প্রতি সরকারের দায়িত্বকে নিজেদের সন্তান-সন্ততির প্রতি পিতার অথবা মাতার দায়িত্বের অনুরূপ মনে করা হয়েছে। পিতা যেমন পোষণ ও কল্যাণের নিশ্চয়তা বিধান করতে বাধ্য, তেমনি সরকার যে সব নাগরিকের ব্যাপার-বিষয়াদি পরিচালনা করে তাদের অর্থনৈতিক কল্যাণ বিধান করতে এবং কোন নাগরিকেরই জীবনমান যাতে একটা ন্যায়সঙ্গত স্তরের নীচে নেমে না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে ন্যায়ত এবং আইনত বাধ্য। এর কারণ, ইসলাম যদিও এ সত্যটিকে সুস্পষ্ট করে দিয়েছে যে শুধুমাত্র দৈহিক অস্তিত্বের অর্থে মানবজীবনকে প্রকাশ করা যায় না, কারণ জীবনের পরম মূল্যসমূহ হচ্ছে আধ্যাত্মিক প্রকৃতির, তবু মানব জীবনের দৈহিক ব্যাপারগুলো থেকে আলাদা করে আধ্যাত্মিক সত্য ও মূল্যগুলোকে দেখার অধিকার মুসলমানদের নেই। সংক্ষেপে এমন একটি সমাজ ইসলামের কাম্য যা শুধু তার নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়েই নয়, বরং কর্মেও ন্যায়ানুসারী, এমন একটা সমাজ যা সেই সমাজের নর-নারী শুধু আত্মিক প্রয়োজনই নয়, তাদের দৈহিক প্রয়োজনও মেটায়। এর অনুসিদ্ধান্ত তা হলে এই যে, কোন রাষ্ট্রকে প্রকৃত ইসলামী রাষ্ট্র হতে হলে তাকে সমাজের ব্যাপার-বিষয়াদি এমনভাবে গুছাতে ও বিন্যস্ত করতে হবে যাতে প্রত্যেকটি নর এবং নারী ন্যূনতম সেই বৈষয়িক ফায়দা পেতে পারে যা ছাড়া কোন মানবিক মর্যাদা, প্রকৃত স্বাধীনতা এবং সর্বশেষে কোন আত্মিক অগ্রগতি সম্ভবপর নয়। অবশ্য এর মানে এ নয় যে, রাষ্ট্র তার নাগরিকদের জন্য সহজ, নিশ্চিন্ত জীবনের নিশ্চয়তা বিধান করবে কিংবা করতে পারে; এর অর্থ শুধু এই যে, ইসলামী রাষ্ট্রে প্রাচুর্যের পাশাপাশি আত্মাকে পিষ্ট করে এমন দারিদ্র্য থাকবে না; দ্বিতীয়ত রাষ্ট্রের সমস্ত সম্পদ অবশ্যই তার সকল নাগরিকের উপযুক্ত জীবনোপায়ের ব্যবস্থা করার জন্য ব্যবহার করতে হবে; এবং তৃতীয়ত, এ ব্যাপারে সকল সুযোগ-সুবিধা সকল নাগরিকের জন্য সমভাবে উন্মুক্ত থাকবে এবং কোন নাগরিকই অন্যদেরকে বঞ্চিত রেখে উচ্চ জীবন-মান ভোগ করবে না। রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ

المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا –

'বিশ্বাসীরা একে অন্যের নিকট একটা ইমারত (এর অংশ) স্বরূপ, প্রত্যেক অংশ অপর অংশগুলোকে দৃঢ় করে।'[৫০] সুতরাং জীবনের প্রত্যেকটি স্তরে পারস্পরিক সহযোগিতা হচ্ছে ইসলামের একটা মৌলিক প্রয়োজন; এবং কোন রাষ্ট্রই ইসলামী রাষ্ট্র বলে অভিহিত হতে পারে না, যদি না সে আইন প্রণয়নের

৫০. আল্-বুখারী ও মুসলিম, আবূ মূসা বর্ণিত।

www.pathagar.com

মারফত এই সহযোগিতার পথ নির্দেশ করে এবং তদ্বারা নাগরিকদেরকে রসূল (সা) কর্তৃক ব্যাখ্যাত ইসলামের চাহিদা অনুযায়ী জীবন যাপনের সামর্থ্য দান করেনঃ

لا تدخلون الجنة حتى تومنوا ولا تومنوا حتى تحابوا ارحموا من فى الارض يرحمكم من فى السماء لايرحم الله من لا يرحم الناس-

'ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা বেহেশ্‌তে প্রবেশ করতে পারবে না; এবং তোমরা ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তোমরা একে অন্যকে ভালোবাসো।'[৫১] 'পৃথিবীতে যারা আছে তাদের প্রতি করুণাশীল হও, তাহলে আকাশে যিনি আছেন তিনি তোমাদের প্রতি করুণাশীল হবেন।'[৫২] আল্লাহ্ সে ব্যক্তির প্রতি কোন করুণা প্রদর্শন করবেন না, সমগ্র মানব জাতির প্রতি যার করুণা নেই।'[৫৩] এবং আরো বিশেষ করে ঃ

ايما مسلم كسا مسلما ثوبا على عرى كسه الله من خضر الجنة ايما مسلم اطعم مسلم على جوع اطعمه الله من ثمار الجنة وايما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من ارحيق المختوم-

'কোন মুসলমান যদি অপর কোন উলংগ মুসলমানকে বস্ত্র দান করে আল্লাহ্ তাকে বেহেশ্‌তের সবুজ সজীবতার পোশাক দান করবেন; এবং কোন মুসলমান যদি ক্ষুধার্ত কোন মুসলমানকে খেতে দেয় আল্লাহ্ তাকে খেতে দেবেন বেহেশ্‌তের ফলমূল এবং কোন মুসলমান যদি কোন পিপাসার্ত মুসলমানকে পানীয় যোগায়, আল্লাহ্ তাকে পান করতে দেবেন বেহেশ্‌তের ঝরণাধারা থেকে।'[৫৪] এবং সর্বশেষে —

ليس المومن بالذى يشبع وجائع الى جنه-

'সে ব্যক্তি ঈমানদার নয় যে তার প্রতিবেশী যখন তার নিকটেই ক্ষুধার্ত রয়েছে, তখন পেট ভরতি করে খায়।'[৫৫]

---

৫১. মুসলিম,আবূ হুরায়রা বর্ণিত।
৫২. আত-তিরমিযী ও আবূ দাউদ, আবদুল্লাহ ইবনে উমর বর্ণিত।
৫৩. আল-বুখারী ও মুসলিম, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ বর্ণিত।
৫৪. আত-তিরমিযী ও আবূ দাউদ, আবূ সাঈদ বর্ণিত।
৫৫. আল্-বায়হাকী, ইবনে আব্বাস বর্ণিত।

www.pathagar.com

শুধু নিজ নিজ সামর্থ্যানুযায়ী দান-খয়রাত করার জন্যই তিনি তার উম্মতদেরকে নসিহত করেছেন পাছে না তাঁর উম্মতদের ঐরূপ ধারণা হয়, সেজন্য রসূল প্রায়ই পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার যে সামাজিক দিক রয়েছে তার উপর জোর দিয়েছেন ঃ

المؤمنون كرجل واحد ان اشتكى عينه اشتكى كله وان اشتكى راسه اشتكى كله- ترى المومنين فى تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد اشتكى عضوا تداعى له سائرالجسد بالسهو والحمى-

'মুমিনেরা একটি মানুষ সদৃশ; তার চোখ অসুস্থ হলে তার সমস্ত শরীরই অসুস্থ হয়ে পড়ে; এবং যদি তার মস্তক পীড়িত হয় তা হলে তার সমস্ত দেহই পীড়িত হয়ে পড়ে।[৫৬] 'মুমিনদেরকে তোমরা চিনতে পারবে তাদের পারস্পরিক করুণা, ভালবাসা ও সহানুভূতি দ্বারা। তারা একটি মাত্র দেহের ন্যায়, এর একটা অঙ্গ অসুস্থ হলে সমস্ত দেহই নিদ্রাহীনতা ও জ্বরে ভোগে।'[৫৭]

এটাই তাহলে ইসলামের গূঢ়তম সমাজতাত্ত্বিক শিক্ষা। যে সমাজ তার কিছু লোককে তারা যে অভাবের লায়েক নয় সে রকম অভাবে ভুগতে দেয় যখন অন্যদের রয়েছে প্রয়োজনের অধিক, সে সমাজ সুখী এবং শক্তিশালী হতে পারে না। অস্বাভাবিক অবস্থার দরুন যদি সমগ্র সমাজকে অভাবে ভুগতে হয় (যেমনটি মুসলমানদের বেলায় ঘটেছিল ইসলামের সূচনার দিকে) সে অভাব আত্মিক শক্তির এবং তারই মাধ্যমে ভাবী মহত্ত্বের উৎস হতে পারে। কিন্তু সমাজের প্রাপ্তি-সাধ্য সম্পদসমূহ যদি এমন অসমভাবে বন্টিত হয় যে সমাজের কোন কোন দল প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করে, অথচ বেশির ভাগ জনসাধারণ তাদের রোজকার খাবারের অনুসন্ধানে তাদের সমুদয় শক্তি নিয়োজিত করতে বাধ্য হয়, তেমন অবস্থায়, দারিদ্র্য আত্মিক প্রগতির সবচেয়ে মারাত্মক শত্রু হয়ে দাঁড়ায় এবং কখনো কখনো সমগ্র সমাজকে ঐশী চেতনা থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং তাকে ঠেলে দেয় আত্মা-বিনাশকারী বস্তুবাদের কবলে। সন্দেহাতীতভাবে এটাই ছিল রসূলের মনে, যখন তিনি এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন ঃ

كادا الفقر ان يكون كفرا-

'দারিদ্র্য কখনো কখনো কুফরী বা সত্য প্রত্যাখ্যানে পরিণত হতে পারে।'[৫৮]

---

৫৬. মুসলিম, নুমান ইবনে বশীর বর্ণিত।
৫৭. আল্-বুখারী ও মুসলিম, নুমান ইবনে বশীর বর্ণিত।
৫৮. আস সুয়ুতি, 'আল-জামী আস সগীর'।

www.pathagar.com

যে ভ্রাতৃত্ব-নীতির উপর ইসলাম দাঁড়িয়ে আছে প্রাচুর্যের মধ্যে দারিদ্র্য হচ্ছে তার সম্পূর্ণ খেলাফ। রসূল করীম (সা) বলেছেন ঃ

والذى نفسى بيده لايومن عبد حتى يحب لاخيه مايحب لنفسه-

'যাঁর হাতে আমি নিজেকে সমর্পণ করেছি তার শপথ! কোন ব্যক্তিই সত্যিকার ঈমানদার হতে পারে না,যদি না সে তার ভ্রাতার জন্য তাই কামনা করে যা সে কামনা করে নিজের জন্য।'[৫৯] তাই, সমাজের অভ্যন্তরে যাতে ন্যায়নীতি বলবৎ থাকে এবং পুরুষ-নারী শিশু-নির্বিশেষে প্রত্যেকটি নাগরিক যাতে যথেষ্ট পরিমাণে খাবার ও পরিধেয় পায়, অসুখ-বিসুখে সাহায্য পায় এবং বসবাসের জন্য সুন্দর (রুচিসম্মত) গৃহ পায়, ইসলামী রাষ্ট্রকে অবশ্যি সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এই লক্ষ্য অনুসারে দেশের সংবিধানে এ ধারা অবশ্যই থাকা চাই যে, প্রত্যেকটি নাগরিকের সংবিধানে এ ধারা অবশ্যই থাকা চাই যে, প্রত্যেকটি নাগরিকের অধিকার থাকবেঃ (ক) সুস্থ অবস্থায় এবং কাজ করার বয়স থাকাকালে উৎপাদনমূলক ও শ্রমের মজুরি দেয়া হয় এমন কাজ পাবার, (খ) এ ধরনের উৎপাদনমূলক কাজের জন্য শিক্ষালাভের — প্রয়োজনবোধে রাষ্ট্রের খরচে, (গ) অসুস্থ হলে বিনা খরচে উপযুক্ত চিকিৎসা পাবার এবং (ঘ) অসুখ-বিসুখ, বৈধব্য, বার্ধক্য, অপ্রাপ্তবয়স্কতা অথবা ব্যক্তির আয়ত্ত-বহির্ভূত অবস্থার কারণজাত বেকারত্বে রাষ্ট্রের নিকট থেকে উপযুক্ত খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয় লাভের।

এ ধরনের একটি সাংবিধানিক আইন প্রণয়নের জন্য পূর্বাহ্নেই দরকার হবে — সমগ্র দেশের জন্য একটা সামাজিক নিরাপত্তা-পরিকল্পনা গ্রহণ এবং রসূলের নিম্নোক্ত নির্দেশ মুতাবিক ধনের উপর ব্যাপক কর ধার্যের মাধ্যমে এর জন্য অর্থ সংগৃহীত হবে ঃ

ترخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم-

'তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান তাদের কাছ থেকে এ গ্রহণ করা হবে এবং তাদের মধ্যে যারা গরীব তাদেরকে তা ফিরিয়ে দেয়া হবে।'[৬০]

যাকাত এবং সম্পত্তি ও আয়ের উপর অতিরিক্ত কর ধার্য এই উভয় উপায়ের মাধ্যম; কারণ, রসূলের উক্তি অনুসারে —

৫৯. আল-বুখারী ও মুসলিম, আনাস বর্ণিত।
৬০. আল-বুখারী ও মুসলিম, আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বর্ণিত।

www.pathagar.com

ان فی المال حق سوی ازکوة-

'যাকাত ছাড়াও সম্পত্তির উপর অবশ্যই একটা হক আছে।'[৬১]

কোন পাঠক যদি মনে করেন যে, এ ধরনের একটি সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার পরিকল্পনা বিশ শতকের একটি উদ্ভাবন, আমি তাদের স্মরণ করিয়ে দেবো যে, এ ব্যবস্থার বর্তমান নামটি নির্ধারণের বহু শতাব্দী পূর্বেই, এমন কি আধুনিক শিল্প সভ্যতার পক্ষে এর প্রয়োজন স্পষ্ট হয়ে ওঠার আগেই এমন একটি ব্যবস্থা পুরোপুরি চালু ছিল, যেমন খুলাফায়ে রাশেদার আমলে ইসলামী সাধারণতন্ত্রে। হযরত ওমর (রা)-ই ২০ হিজরীতে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর আদমশুমারীর উদ্দেশ্যে 'দীওয়ান' নামক একটা বিশেষ সরকারী বিভাগের গোড়াপত্তন করেন। এই আদমশুমারের ভিত্তিতে কতিপয় শ্রেণীর লোকের জন্য বার্ষিক রাষ্ট্রীয় পেনসন নির্ধারিত হতো। এরা হচ্ছেন ঃ (ক) বিধবা এবং এতিমেরা, (খ) রসূলের জীবিতকালে ইসলামের সংগ্রামে যারা পুরোভাগে ছিলেন তাঁদের সকলে, রসূলের বিধবা পত্নীগণ, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে যাঁরা বেঁচেছিলেন তাঁরা, গোড়ার দিকের মুহাজিরগণ ইত্যাদি এবং (গ) সকল অক্ষম, পঙ্গু, অসুস্থ বৃদ্ধ লোকেরা। এই পরিকল্পনা মুতাবিক ন্যূনতম বার্ষিক ভাতার পরিমাণ ছিল দু'শ দিরহাম। এমন কি শিশুরা নিজেদের ভরণ-পোষণ করতে অসমর্থকালে এই নীতির ভিত্তিতে জন্মমুহূর্ত থেকে শুরু করে সাবালকত্ব প্রাপ্তি পর্যন্ত সময়ের জন্য শিশুদের নিয়মিত ভাতারও ব্যবস্থা করা হয়েছিল, আর এই ভাতা দেয়া হতো তাদের বাপ-মা অথবা অভিভাবকদেরকে। হযরত ওমর তাঁর জীবনের শেষ বছরে একাধিকবার বলেছেনঃ 'আল্লাহ্ যদি আমাকে পরমায়ু দেন আমি দেখবো — যাতে করে 'সানা' পর্বতমালার নিঃসঙ্গ মেষ পালকও জাতির সম্পদে তার অংশ পায়।'[৬২] বাস্তব প্রশ্ন বা সমস্যাদির উপলব্ধির যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ক্ষমতা তাঁর ছিল তাঁরই বদৌলতে হযরত ওমর গড়পড়তা একজন মানুষের পূর্ণ স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষমতা বজায় রাখার জন্য ন্যূনতম কী পরিমাণ খাদ্য দরকার তা নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে একবার ত্রিশজন লোকের একটি দলকে দিয়ে পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ পর্যন্ত করেছিলেন এবং এইসব পরীক্ষণ-নিরীক্ষণের পর তিনি আদেশ দিয়েছিলেন — দেশের প্রত্যেকটি নর এবং নারী (আর্থিক ভাতা ছাড়াও, যে ভাতা হয়তো তারা ভোগ করছে) প্রত্যেক দিন দু'বেলা পেট ভরে খাওয়ার মতো প্রচুর গম মাসিক ভাতা হিসেবে পাবে।[৬৩] অবশ্যি হযরত ওমর তাঁর

৬১. আত্-তিরমিযী ও ইবনে মাজা, ফাতিমা বিনতে ওয়ায়েস বর্ণিত।
৬২. ইবনে সাদ ৩/১ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২১৪-২১৭
৬৩. ইবনে সাদ ৩/১ খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২১৯-২২০

www.pathagar.com

সামাজিক নিরাপত্তার মহৎ পরিকল্পনা পুরোপুরি বাস্তবায়িত করার আগেই ঘাতকের ছুরিকাঘাতে শাহাদাত বরণ করেন। দুঃখের বিষয়, তাঁর অসমাপ্ত কাজ চালিয়ে নেবার মতো দূরদৃষ্টি বা প্রশাসনিক সামর্থ্য কোনটাই তাঁর পরবর্তীদের ছিল না। ইসলামের ইতিহাসের আরো অনেক সংকট মুহূর্তে যেমন ঘটেছে এখানেও তেমনি একটা গৌরবোজ্জ্বল সূচনাকে হারিয়ে যেতে দেয়া হলো বিস্মৃতির অন্তরালে। এতে করে ইসলাম এবং ইসলামের অনুসারীদের সামাজিক বিকাশ হলো ক্ষতিগ্রস্ত। আজ আমাদের সামনে রয়েছে তেরোশ' বছরের অভিজ্ঞতার সঞ্চয়, আমাদের কি উচিত নয় যে আমরা সেই লজ্জাকর অবহেলার সংশোধন করি এবং হযরত ওমরের কাজ সম্পূর্ণ করি? আল্লাহ্‌র রসূল বলেছেন ঃ

ان الله تعالى يقول يوم القيامة : يا ابن ادم ا حرضت فلم تعدنى قال : يارب كيف اعودك وانت رب ا لعالمين ؟ قال : اما علمت ان عبدى فلان حرض فلم تعده ؟ اما علمت انك لوعدته لوجدتنى عنده؟ يا ان ادم! استطعمنك فلم استطعمك عبدى فلان فلم تطعمه ؟ اما علمت انك لو اطعمته لوجدت ذالك عندى؟ يا ان ادم ! استسقينك فلم تسقنى قال : يارب كيف اسقيك وانت رب العالمين ؟ قال استسقاك عبدى فلان فلم تسقه اما علمت انك مو سقيته وجدت ذالك عندى؟

'জেনে রাখো কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ বলবেন, 'হে আদম সন্তান; আমি অসুস্থ ছিলাম এবং তুমি আমাকে সাহায্য করোনি।' মানুষ বলবে, 'প্রতিপালনক! আমি কি করে সাহায্য করতে পারতাম তোমাকে–তুমি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালক।' এবং আল্লাহ্ জবাব দেবেন, 'তুমি কি জানতে না আমার বান্দাদের মধ্যে অমুক অমুক অসুস্থ ছিল এবং তাকে তুমি সাহায্য করোনি? তুমি কি জানতে না যে তুমি যদি তা করতে তা হলে তুমি অবশ্যই তার সঙ্গে আমাকে পেতে? হে আদম সন্তান! আমি তোমার নিকট খাবার চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে খাওয়াওনি?'

হে প্রতিপালক! আমি তোমাকে কি করে খাওয়াতে পারতাম–তুমি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালক।'

এর জবাবে আল্লাহ্ বলবেন, 'তুমি কি জানতে না আমার বান্দাদের মধ্যে অমুক অমুক তোমার নিকট খাবার চেয়েছিল এবং তুমি তাকে খাওয়াওনি? তুমি

www.pathagar.com

কি জানতে না যে তুমি যদি খাওয়াতে, তা হলে তুমি তা অবশ্যি (আবার) আমার কাছে পেতে? হে আদম সন্তান! আমি তোমার নিকট পানীয় চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে পানীয় দাওনি।'

মানুষ তার জবাবে বলবে, 'আমি তোমাকে কী করে পানীয় দিতে পারতাম–তুমি তো সমস্ত বিশ্বজগতের প্রতিপালক। কিন্তু আল্লাহ্ উত্তরে বলবেন, আমার বান্দাদের মধ্যে অমুক অমুক তোমার নিকট পানীয় চেয়েছিলে, কিন্তু তুমি তাকে তা দাওনি। তুমি জানতে না যে তুমি যদি তাকে পানীয় দিতে তুমি তা (আবার) পাবে।'[৬৪]

৬৪. মুসলিম, আবূ হুরায়রা বর্ণিত।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার

আমাদের পথের বাধা

যে রাষ্ট্র শুধু নামে নয়, কার্যতও ইসলামী রাষ্ট্র হবে তার সংবিধানে শরীয়ার যেসব মৌলিক নীতির অভিব্যক্তি অপরিহার্য সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা এখানেই শেষ হলো।

আমি এ গ্রন্থে কোন রাষ্ট্রের সংবিধানের 'ব্লু-প্রিন্ট' বা নক্শা জাতীয় কিছু দেবার চেষ্টা করিনি। আমি শুধু চেষ্টা করছি রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনা সম্পর্কে ইসলামের স্বতঃপ্রমাণ বিধি-বিধানগুলোকে তুলে ধরার জন্য, বর্তমানকালের প্রয়োজন মেটাতে হলে এগুলোর প্রয়োগ পদ্ধতি কি হবে তা আলোচনা করার জন্য এবং যে সংবিধান ইসলামী সংবিধান হওয়ার দাবি করে সর্বাবস্থায় তাতে আইনের যেসব ধারা থাকা অপরিহার্য সে-সবের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য। এই পুস্তকের সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে আমি দেখাতে চেয়েছি যে, ইসলামে আমরা তার নিজস্ব রাষ্ট্রীয় বিধানের সুনির্দিষ্ট সুস্পষ্ট কাঠামোটি পাচ্ছি উৎসমূল থেকে, যার খুঁটিনাটিগুলো নিষ্পন্ন করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্টকালের ইজতিহাদের উপর।

বলা অনাবশ্যক যে, ইসলামী রাষ্ট্র সংগঠনের ভিত্তিমূলে যেসব তন্ত্র ও পদ্ধতি থাকা আবশ্যক, শুধু সে সবের আলোচনা দ্বারা ইসলামের সামগ্রিক পরিকল্পনার প্রতি পুরোপুরি সুবিচার করা হয় না। কারণ রাজনৈতিক কার্যকলাপে একটি কর্মসূচীর চেয়ে ইসলাম অনেক বড় জিনিস; ইহা বিশ্বাস ও নৈতিকতার একটা পদ্ধতি, একটা সামাজিক মতবাদ এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক সকল ব্যাপারে ইহা সদাচরণের প্রতি একটা আহবান; ইহা একটি পরিপূর্ণ, স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনাদর্শ যা আমাদের জীবনের নৈতিক এবং দৈহিক, আধ্যাত্মিক এবং মানসিক, ব্যক্তিগত এবং সামাজিক সকল দিককে 'মানব-জীবন' নামক একটি অবিভাজ্য সমগ্রের অংশ বলে মনে করে। কিন্তু যেহেতু ইসলামী জীবনাদর্শ এমনতরো পূর্ণ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ — বিশেষ এ কারণেই এর অনুসারীরা শুধু ইসলামের বিন্যাসগুলো অবলম্বন করে নিত্যকার ইসলামী জীবন-যাপন করতে

www.pathagar.com

পারেন এর চাইতে অনেক বেশি কিছু তাদের করতে হবে। তারা যদি চায় যে, ইসলাম একটি শূন্যগর্ভ শব্দ থাকবে না, তা হলে তাদেরকে তাদের বাহ্য আচরণ ও তাদের বিশ্বাসের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে। মনোভঙ্গি ও চেষ্টার মধ্যে এ ধরনের একটা সমন্বয় অসম্ভব, যদি না গোটা সমাজ ইসলামের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিধানাবলী মেনে নিতে বাধ্য হয়। সুতরং শুধুমাত্র ইসলামের মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সরকার পরিচালনা, আইন প্রণয়ন ও আইন বলবৎ করার ক্ষমতাবান একটি স্বাধীন আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যেই ইসলামের আদর্শসমূহকে বাস্তবে ফলপ্রসূ করে তোলা সম্ভব।

আমরা যে জগতে বাস করছি, তা প্রায় সম্পূর্ণভাবে বংশ-গোত্রভিত্তিক কিংবা সর্বোত্তম অবস্থায়, শুধু সংস্কৃতি-ভিত্তিক জাতীয়তার ধারণা দ্বারা শাসিত। এই পটভূমিকায় বাকী বিশ্ব যাকে আধুনিক এবং বাঞ্ছনীয় গণ্য করে তা থেকে ইসলামী রাষ্ট্রের ধারণা এত সুদূরের ব্যাপার যে, রাষ্ট্র সংগঠনের ভিত্তি হিসেবে কোন ধর্মীয় আদর্শের ওকালতি প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হতে বাধ্য।

আমাদের কালের প্রায় সকল লোক জাতিত্বের একমাত্র বৈধ সূত্র হিসেবে রক্ত-বর্ণগত (racial) মিলও ঐতিহাসিক ঐতিহ্যকে গ্রহণ করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে; পক্ষান্তরে আমরা মুসলমানেরা মনে করি ঃ আদর্শভিত্তিক সমাজ — যে সমাজের অন্তর্ভুক্ত লোকেরা সাধারণভাবে জীবন সম্পর্কে একটা নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি এবং একটা নির্দিষ্ট নৈতিক মূল্যমানের অধিকারী, তাই — মানুষের আকাঙ্খিত জাতিত্বের শ্রেষ্ঠতম রূপ। আমাদের বিশিষ্ট আদর্শ ইসলাম স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রদত্ত বিধান — এ দাবি আমরা যে শুধু আমাদের প্রত্যয় থেকেই করে থাকি তা নয়, আমাদের বিচার-বুদ্ধিও এ কথা বলে যে, একই ধরনের ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ, রক্ত-বর্ণ ভাষা অথবা ভৌগলিক অবস্থানজাত সমাজের চেয়ে মানবজীবনের অনেক অনেক উন্নততর অভিব্যক্তি।

আমরা যদি আমাদের সমাজ রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে ইসলামের উদ্দিষ্ট উপকরণে ও রূপে ঢালাই করে নেবার সিদ্ধান্ত করি, তাহলে আমরা যেসব অসুবিধার সম্মুখীন হবো, সেগুলোকে তুচ্ছ করা যায় না। একটা কথা মনে রাখতে হবে ঃ শত শত বছরের দাসত্বে ও পতনে পংকিলতায় মুসলমান সমাজের শক্তি নিঃশেষিত ও তার সামাজিক নীতিবোধ বিনষ্ট হওয়ার পর আজ একটা সত্যিকার ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা কায়েম করা সহজ কাজ নয়। রাজনৈতিক ক্ষয়িষ্ণুতার এই সময়ে মুসলমানেরা তাদের সাংস্কৃতিক আত্মবিশ্বাসও বহুল পরিমাণে হারিয়ে ফেলেছে এবং তাদের অনেকের পক্ষেই আজ পাশ্চাত্য পরিভাষায় State এবং Nation সম্পর্কে চিন্তা না করা এবং তার পরিবর্তে ইসলামী পরিভাষায় চিন্তা

www.pathagar.com

করা কষ্টকর। তারা অন্ধভাবে এই সরল বিশ্বাসে পাশ্চাত্য চিন্তা-রীতির অনুসরণ করেন যে, পাশ্চাত্য জগত থেকে যা কিছুই আসে তা মুসলমানেরা নিজেরা যা সৃষ্টি করতে সক্ষম তার চাইতে অবশ্যই অধিকতা 'আপ-টু-ডেট' বা আধুনিক। এবং এই প্রত্যয় থেকে তার পাশ্চাত্য রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণাসমূহকে তাদের নিজেদের প্রত্যেকটি ব্যাপারে দায়িত্বহীনভাবে প্রয়োগ করে থাকেন। পক্ষান্তরে বহু রক্ষণশীল মুসলমান — যাঁরা কথায় ও কর্মে প্রচলিত সকল বাহ্য নিয়ম বা তন্ত্রকে বজায় রাখার উপর জোর দিয়ে থাকেন এবং ফলস্বরূপ তাদের সমাজের পাশ্চাত্যায়নের বিরোধিতা করেন, তাঁরা ইসলামের প্রকৃত মূল্যগুলোর ভিত্তিতে ততটা এ বিরোধিতা করেন না, যতটা করেন আমাদের ক্ষয়িষ্ণুতার শত শত বছরে যেসব সামাজিক রীতি-নীতির উদ্ভব ঘটেছে সেগুলোর ভিত্তিতে। মনে হয়, তাদের মন এই অনুমানের উপর কাজ করে যে, ইসলাম এবং মুসলিম সমাজের রীতিনীতি এক এবং অভিন্ন (যা প্রত্যেকটি চিন্তাশীল ব্যক্তির মতেই একটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত অনুমান) এবং সে কারণে, আমাদের সামাজিক আচরণ এবং রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনা সম্পর্কিত সমস্যাসমূহের প্রতি আমাদের মনোভাব — এই উভয়ক্ষেত্রেই আমাদের ইতিহাসের ধারায় যে সব রীতিনীতির উদ্ভব ঘটেছে যা-কিছু দ্বারা সেগুলোর বর্ণনা বুঝায়, তা-ই ইসলাম বিরোধী এবং সেকারণে ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য হচ্ছে যে-সব সামাজিক প্রয়াস-পদ্ধতির মধ্যে আমরা এতকাল বাস করে এসেছি সেগুলোর স্থায়িত্ব বিধান ও সেগুলোর প্রতি আইনের অনুমোদন দান। অন্য কথায়, আমাদের এসব রক্ষণশীল ব্যক্তি এটা স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিয়েছেন যে, যে সব অবস্থার বন্ধ্যা অনমনীয়তার দরুন আজ মুসলমানদের পক্ষে ইস্‌লামের সত্যিকার শিক্ষা অনুযায়ী জীবনযাপন অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেসব অবস্থার সংরক্ষণের উপরই ইসলামের টিকে থাকা নির্ভর করছে। পাঠক স্বীকার করবেন, এ অত্যন্ত দুর্বল যুক্তি। কিন্তু এ-সব অনুমান যত হাস্যকরই হোক না কেন, এগুলোর ভিত্তিতেই আমাদের রক্ষণশীল সমালোচক গোষ্ঠীর মন কাজ করে। আমাদের সামাজিক ধ্যান-ধারণা এবং অভ্যাসে কোন পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা মেনে নিতে তাঁদের অস্বীকৃতির দরুন অসংখ্য মুসলিম নর-নারী পাশ্চাত্যের অসহায় অনুকরণে বাধ্য হচ্ছেন। বলা বাহুল্য, আধুনিক ইসলামী রাষ্ট্র আমাদের অতীতের ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তসমূহেরই হুবহু প্রতিরূপ হবে — রক্ষণশীল গোষ্ঠীর এই দাবি ইসলামী রাষ্ট্রের ধারণাকেই অশ্রদ্ধেয় এবং হাস্যকর করে তুলতে পারে।

আমাদের নিজেদের সাংস্কৃতিক ক্ষয়িষ্ণুতা এবং বহু শতাব্দী ধরে মুসলিম চিন্তার স্থবিরতাজনিত নানা অসুবিধা ছাড়াও আমাদের দেশগুলোকে সত্যিকার ইসলামী পন্থায় পুনর্গঠন করার যে কোন চেষ্টা অনিবার্যভাবেই অমুসলিম জগতে

www.pathagar.com

নানাবিধ আশংকা জাগ্রত করে এবং আমাদের এই পথে অমুসলিম জগত কর্তৃক সর্বপ্রকার বাধা সৃষ্টির কারণ ঘটায়। ক্রুসেডের সময় থেকেই পাশ্চাত্য জগতে ইসলাম বিকৃতরূপে ব্যাখ্যাত হয়ে আসছে এবং ইসলামের সর্বপ্রকার প্রস্তাবনা সম্পর্কে একটা গভীর অবিশ্বাস — যা প্রায় ঘৃণারই শামিল–পাশ্চাত্য জগতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একটা অবিচ্ছেদ্য অংগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাশ্চাত্যবাসীরা ইসলামের শিক্ষায় যে তাদের নিজ ধর্মের নেক মৌলিক বিশ্বাসের অস্বীকৃতিই শুধু দেখতে পায় তা নয়, একটা রাজনৈতিক হুমকিও দেখতে পায়। তাদের ঐতিহাসিক স্মৃতি এবং এই মুসলিম জাহান ও ইউরোপের মধ্যে তীব্র সংগ্রামের শতাব্দীগুলোর প্রভাবে তারা সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবেই মনে করে যে, সকল অমুসলমানের প্রতিই একটি বিরুদ্ধতা ইসলামে অন্তর্নিহিত রয়েছে এবং এ জন্য তাদের আশংকা এই যে, ইসলামের মূলমন্ত্রের পুনরুজ্জীবন — যা ইসলামী রাষ্ট্রের ধারণার মধ্যে অভিব্যক্ত — মুসলমানের ঘুমন্ত শক্তিকে পুনরায় জাগ্রত করতে এবং পাশ্চাত্য জগতের অভিমুখে তাদেরকে নতুন নতুন আক্রমণাত্মক অভিযানে মাতিয়ে তুলতে পারে। এ ধরনের একটা সম্ভাব্য প্রবণতাকে রোখার উদ্দেশ্যে পাশ্চাত্যবাসীরা মুসলিম দেশগুলোতে রাজনৈতিক ক্ষমতার পুনরুত্থান এবং মুসলিম সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনে ইসলামকে তার পূর্বতন কর্তৃত্বের ভূমিকায় পুনঃ সংস্থাপনের পথে বাধা সৃষ্টির জন্য চূড়ান্ত চেষ্টা চালিয়ে আসছে। তাদের প্রতিরোধের উপায়গুলো শুধু রাজনৈতিক নয়, এগুলো সাংস্কৃতিকও বটে। পাশ্চাত্য বিদ্যালয়সমূহের এবং মুসলিম জগতে পাশ্চাত্য শিক্ষার ছাঁচে–ঢালা শিক্ষা–পদ্ধতির মাধ্যমে মুসলিম সমাজের তরুণ–তরুণীদের মনে একটা সামাজিক মতাদর্শ হিসেবে ইসলামের প্রতি পরিকল্পিতভাবে অবিশ্বাস ও অনাস্থার বীজ বপন করা হচ্ছে এবং ইসলামকে অশ্রদ্ধেয় করে তোলার এই অভিযানে প্রধান হাতিয়ারটি অজ্ঞাতসারে আমাদের নিজ সমাজের অভ্যন্তরস্থ রক্ষণশীল ব্যক্তিবর্গই সরবরাহ করছেন। আধুনিক ইসলামী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও পদ্ধতিসমূহকে অবশ্যই ইসলামের প্রথম যুগে উদ্ভাবিত ছকের হুবহু অনুরূপ হতে হবে এর উপর জোর দিয়ে (যে জোর বা তাকিদের জন্য আল–কুরআন এবং সুন্নাহ্‌তে বিন্দুমাত্র সমর্থন নেই)। মুহম্মদ (সা)–এর বাণীর এইসব স্বয়ং–নিযুক্ত অভিভাবক বহু শিক্ষিত মুসলমানের জন্য আমাদের কালের জরুরী রাজনৈতিক প্রয়োজনাদি মেটানোর একটা বাস্তব প্রস্তাবনা হিসেবে শরীয়াকে গ্রহণ অসম্ভব করে তোলেন। সুস্পষ্টভাবে কুরআনের সমস্ত নির্দেশের বিরুদ্ধে অমুসলিম এলাকার উপর আক্রমণের মাধ্যমে মুসলিম শাসন বিস্তারের একটা হাতিয়াররূপে জিহাদের ধারণাকে উপস্থাপিত করে তাঁরা অমুসলিমদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করেন এবং সেই ধরনের একটা প্রবণতায় সুস্পষ্টভাবে

www.pathagar.com

নিহিত অবিচারের আশংকা বহু সৎ মুসলমানের হৃদয়ে বিরক্তিতে ভরে দেয়। এবং শেষ কথা, জীবনের সকল সামাজিক ব্যাপারে মুসলিম এবং অমুসলিম নাগরিকদের মধ্যে ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকদের প্রতিবন্ধকস্বরূপ পৃথক নীতি অনুসরণ করা আমাদের উপর শরীয়া কর্তৃক আরোপিত কর্তব্য — (আল-কুরআন এবং সুন্নাহতে এরও কোন সমর্থন নেই) এই দাবি দ্বারা সংখ্যালঘুরা যে দেশে বাস করছে, সে দেশ ইসলামী রাষ্ট্র হয়ে উঠুক ধৈর্যের সঙ্গে সংখ্যালঘুদের পক্ষে এই চিন্তাকেও তাঁরা অসম্ভব করে তোলেন।

সাধারণভাবে অমুসলিম জগত এবং বিশেষ করে অমুসলিম নাগরিকদের সংশয়াশংকা দূর করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে যে, ইসলামের সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার লক্ষ্য মুসলমান-অমুসলমান সকলের প্রতি সমান সুবিচার এবং সত্যিকার একটি ইসলামী রাষ্ট্র স্থাপনের প্রচেষ্টায় আমরা শুধু নৈতিক বিচার-বিবেচনার দ্বারাই পরিচালিত। সংক্ষেপে, সমগ্র বিশ্বের কাছে আমরা প্রমাণ করতে চাই ঃ

كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله -

'তোমরাই মানব জাতির কাছে প্রেরিত সর্বোত্তম জাতি (এ কারণে যে) তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দাও এবং মন্দ কাজ নিষেধ কর এবং আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস রাখ।'

আল-কুরআনের এই বাণী মুতাবিক জীবনযাপনই আমাদের প্রকৃত অভিপ্রায় কিনা তা নির্ভর করছে সকল মানুষের জন্য সুবিচার প্রতিষ্ঠা এবং অবিচার উচ্ছেদের জন্য সকল সময় ও সর্বাবস্থায় আমাদের সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতির উপর এবং এতে কোন প্রকৃত ইসলামী সমাজের সেই সমাজের মধ্যে বসবাসকারী অমুসলিমদের প্রতি কখনো অন্যায়াচারী হওয়ার সম্ভাবনা থাকার কথা নয়।

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে রক্ষণশীল মুসলমানদের বন্ধ্যা বাহ্যানুষ্ঠানভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির ফলে সৃষ্ট দ্বিতীয় বাধাটি আমরা তবেই অতিক্রম করতে পারি, যদি আমরা আল-কুরআন এবং সুন্নাহতে লিপিবদ্ধ রাষ্ট্রীয় আইনের প্রশ্নটিকে সমস্ত 'ঐতিহাসিক পূর্ব দৃষ্টান্ত' এবং পূর্ব-পুরুষদের নিকট থেকে প্রাপ্ত বিশেষ বিশেষ যুগের জন্য উদ্ভাবিত সকল ব্যাখ্যার প্রভাব মুক্ত হয়ে সৃজনধর্মীয় মনোভাব নিয়ে বিচার করি। অন্য কথায়, আমাদের রক্ষণশীলদের আপত্তির জবাবে আমাদেরকে অবশ্যই দেখাতে হবে যে, ইসলামের বিধান শুধুমাত্র

www.pathagar.com

চুলচেরা তর্কপূর্ণ ফিকাহ্‌র কিতাব এবং শুক্রবারের জুম্মার বাকসর্বস্ব খুত্‌বার বিষয়বস্তু নয়। বরং এটা মানব জীবনের একটি জীবন্ত ও গতিশীল কর্মসূচী, যে কর্মসূচী স্বয়ংসম্পূর্ণ (sovercing) যে কোন বিশেষ পারিপার্শ্বিকতা থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং সে কারণে, সকল কালে এবং সকল অবস্থায় তা প্রযোজ্য। সংক্ষেপে, এটা এমন একটা কর্মসূচী, যা আমাদের সমাজের ক্রমবিকাশকে তো বাধাগ্রস্ত করবেই না, পরন্তু জগতে বর্তমান সকল সমাজের মধ্যে একে করবে সবচেয়ে প্রগতিশীল, সবচেয়ে আত্মনির্ভরশীল ও সবচেয়ে বলিষ্ঠ।

আইনের সার সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা

ইসলামী আইনকে সংগ্রথিত করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কয়েকটি কথা না বলে ইসলামী রাষ্ট্রের মৌলিক নীতিগুলো সম্পর্কিত এ আলোচনা আমি শেষ করতে পারি না। আমরা লক্ষ্য করেছি, ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বাগ্রগণ্য বক্তব্য হচ্ছে তার এখতিয়ারভুক্ত অঞ্চলগুলোতে শরীয়ারই নির্দেশসমূহ কার্যকরী করা এবং এই উদ্দেশ্যে আমাদের প্রয়োজন শরয়ী আইনগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত সুস্পষ্ট বোধগম্য সংকলন। কিন্তু এ ধরনের একটি সংকলন কোথায় পাওয়া যেতে পারে? জবাবটি সুস্পষ্ট আল্‌-কুরআন এবং সুন্নাহ্‌র নস্‌ (نص) নির্দেশসমূহে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এসব নস্‌ নির্দেশকে কি কখনো তাদের সামগ্রিকরূপে উদ্ধার করা হয়েছে এবং এসবের সঙ্গে মামুলি ফিকাহ্‌র সাহায্যে নিষ্পন্ন যেসব অনুসিদ্ধান্তমূলক সংযোজন ঘটেছে সেগুলোকে বাদ দিয়ে মুসলিম সমাজের কাছে এগুলো কি কখনো উপস্থাপিত হয়েছে? দুর্ভাগ্য এই যে, এর উত্তর বলতে হয় কখনোই তা করা হয়নি। মুসলমানদেরকে ইসলামী আইনের একটি সত্যিকার, সহজ এবং সে কারণেই সহজবোধ্য চিত্র না দিয়ে হাজার বছর আগে কতিপয় পন্ডিত এবং মযহাব যেসব ফিকহী অনুসিদ্ধান্ত এবং ব্যাখ্যায় উপনীত হয়েছিলেন — সে সবেরই একটি বৃহদাকার এবং বহু দিক বিশিষ্ট কাঠামো দেয়া হয়েছে। কিন্তু এসব অনুসিদ্ধান্ত এবং ব্যাখ্যা যে শুধু সংখ্যায় বহু এবং অত্যন্ত জটিল তাই নয়, আইনের অত্যন্ত মৌলিক বিষয়েও এগুলো প্রায়ই পরস্পর বিরোধী। ইসলমের লক্ষ্য কি এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে মুসলমানের আচরণ কি হওয়া উচিত, এ সম্পর্কে জানা কী মযহাবের সুন্নী ফিকাহবিদ আর দ্বাদশ ইমামে বিশ্বাসী একজন শিয়া অথবা একজন সূফীর দৃষ্টিভঙ্গি নিশ্চয়ই এক নয় — ক্ষুদ্রতর বহু মযহাবের উল্লেখ এক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন। তা হলে বিভিন্ন ফিকাহ পদ্ধতির মধ্যে কোনটিকে একটি ইসলামী রাষ্ট্রের সাধারণ আইন (public Law) সংগ্রহের (Code) ভিত্তি হিসেবে ইসলামী রাষ্ট্রের গ্রহণ করা উচিত?

www.pathagar.com

কেউ কেউ অবশ্য যুক্তি দেখাতে পারেন যে, প্রত্যেক মুসলিম দেশেরই উচিত এই উদ্দেশ্য যে দেশের জনসাধারণের সংখ্যাগুরু অংশ যেসব ফিকাহ্‌র বিধান অনুসরণ করেন, সেগুলোকে কাজে লাগানো।

কাজেই যে দেশ প্রধানত হানাফীদের দ্বারা অধ্যুষিত, সে দেশে হানাফী ফিকাহ্‌ই সাধারণ আইনের ভিত্তি হওয়া উচিত; যে দেশ প্রধানত শিয়া অধ্যুষিত, সে দেশের এই ভিত্তি হওয়া উচিত জাফরী ফিকাহ্‌ ইত্যাদি। কিন্তু এ ধরনের একটা পদ্ধতির বিরুদ্ধে ন্যূনপক্ষে দুটো গুরুতর আপত্তি আছে। একদিকে বর্তমান ফিকাহ্‌ পদ্ধতিগুলোর কোনটিরই আমাদের কালের প্রয়োজনের সঙ্গে সত্যিকার কোন সঙ্গতি নেই; কারণ, এগুলো প্রধানত আমাদের নিজেদের কাল থেকে বহুল পরিমাণে ভিন্ন এক সময়ের অভিজ্ঞতার দ্বারা নিরূপিত অনুসিদ্ধান্তেরই রূপ। পক্ষান্তরে, ইহা অকল্পনীয় যে, যে-রাষ্ট্র ইসলামী রাষ্ট্র বলে দাবি করে, সে রাষ্ট্রে জনসংখ্যার শুধু একটিমাত্র অংশেরই কাছে — সেই অংশটি যদি সংখ্যাগুরু হয় — ফিকাহ্‌র যেসব শিক্ষা গ্রহণযোগ্য সেগুলো সমাজের অন্তর্ভুক্ত সংখ্যালঘু অংশের উপর তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চাপিয়ে দেয়া হবে এবং এভাবে রাজনৈতিক অর্থেও তাদেরকে সংখ্যালঘুর পর্যায়ে ঠেলে দেয়া হবে; কারণ, এ ধরনের একটি খেয়াল-খুশি পন্থা হবে মানুষের সাম্য এবং ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কিত কুরআনী নীতিরই সুস্পষ্ট বিরোধী। ফলে, ইসলামী রাষ্ট্রের হাতে শরীয়ার এমন একটি সংকলন থাকা চাই যা ঃ (ক) মযহাব নিরপেক্ষভাবে রাষ্ট্রের মুসলিম নাগরিকদের কাছে সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য হবে ও (খ) ঐশী আইনের শাশ্বত এবং অপরিবর্তনীয় চরিত্রটিকে এমনভাবে ব্যক্ত করবে যাতে করে মানুষের সামাজিক ও মানসিক বিকাশের সকল পর্যায়ে এর প্রযোজ্যতা প্রমাণিত হয়।

আধুনিক মুসলিম বিশ্ব এই দ্বিমুখী প্রয়োজনীয়তা যে তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে অন্য বহু বিষয় ছাড়াও প্রায়ই প্রদত্ত একটি পরামর্শে তা সুস্পষ্ট' পরামর্শটি এই যে, বর্তমান মযহাবগুলোর শিক্ষার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে; তারপর আধুনিক চিন্তা ও আধুনিক জীবন পরিবেশের আলোকে সেগুলো সংশোধন করতে হবে। আমার কিন্তু মনে এ ধরনের একটা চেষ্টার উদ্দেশ্যেই যে শুধু ব্যর্থ হবে তা নয় বরং এ জাতীয় চেষ্টার ফলে, শরীয়ার সম্পর্কেই মুসলিম মনোভাবের ক্ষেত্রে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে।

প্রথমত ইসলামী ফিকাহ্‌র বিভিন্ন মযহাবের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান বাহ্যত যত বাঞ্ছনীয় হোক না কেন — সম্ভবত তা থেকে এমন কোন সার সংগ্রহ করা সম্ভব নয়, যা সহজ এবং সে কারণে গড়পড়তা বুদ্ধিসম্পন্ন অথচ বিশেষজ্ঞ নয় এমন মুসলমানের অধিগম্য; কারণ এ সামঞ্জস্য বিধানের অর্থ মামুলি ফিকাহ (সকল মযহাবের) যে অসংখ্য এবং দূরকল্পনাভিত্তিক অনুসিদ্ধান্ত নিয়ে গঠিত,

www.pathagar.com

সে সবেরই একটা কৃত্রিম সমন্বয়ের বেশি কিছু নয়। এর ফলে হবে দূরকল্পনাভিত্তিক ফিকাহর জটিলতর এক পদ্ধতি।

দ্বিতীয়ত এ ধরনের একটি সমন্বয় বহু মুসলমানের মনে যে বিভ্রান্তি রয়েছে তাকেই শুধু স্থায়িত্ব দান করবে। তাদের সে বিভ্রান্তি হচ্ছে একদিকে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল যে-বিধান দিয়েছেন (অন্য কথায়, বিধানদাতা আল্-কুরআন ও সুন্নাহর 'নস্' এ আইনের পরিভাষায় যাকে আইন বলে উল্লেখ করেছেন) ও ন্যূনপক্ষে যুগ যুগ ধরে মুসলিম পণ্ডিতেরা আইন সম্পর্কে যা ভেবেছেন এ দুয়ের মধ্যে। তাতে শরীয়া সম্পর্কে আমাদের ধারণাও ইতিহাসের একটি বিশেষ কালে প্রচলিত চিন্তাপ্রণালী অর্থাৎ কাল-নিরুপিত মানবিক চিন্তা দ্বারা শৃঙ্খলিত হবে।

তৃতীয়ত মুসলমানরা সহজাত এবং অভ্রান্তভাবেই যে স্থায়িত্ব ও স্থিতিশীলতাকে ঐশী বিধানের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করেন, আধুনিক অবস্থার আলোকে শরীয়ার সংস্কার-প্রয়াস তার শেষ চিহ্নকেও মুছে দেবে। কারণ, এই মুহূর্তে যদি সংস্কারের প্রয়োজন হয় তা হলে কয়েক যুগ পরেও তা অবশ্যি প্রয়োজন হবে — যখন 'আধুনিক অবস্থান আবার বদলে যাবে' এবং এভাবেই চলতে থাকলে ইসলামী আইন সংস্কারের মাধ্যমেই একদিন সম্পূর্ণ লোপ পাবে। যদি ইহা যুক্তিসঙ্গত হত তা হলে আমাদের একথা বলার কি অধিকার আছে যে, আইনদাতা ইসলামের আইনকে চিরন্তর ব্যবস্থা বলেই ধারণা করেছেন। সে অবস্থায় একথা বলাই কি অধিকতর যথার্থ হবে না যে, আইন কর্তৃক অবস্থা সৃষ্টি হয় না বরং আইন অবস্থারই অনুগামী এবং এ কারণে ইহা ঐশী আইন হতে পারে না। এ ধরনের একটি পরাজয়ী মনোভাব দ্বারা আমাদের এ বিভ্রান্তি দূর করা সম্ভব নয়; ঐশী আইনের চিরন্তন অপরিবর্তনীয় চরিত্রের প্রশ্নে আপস করেও এ বিভ্রান্তির সমাধান করা যাবে না — কখনো না। পক্ষান্তরে, আমরা এই বৈধতা ও এই চরিত্রকে সাফল্যের সঙ্গে রক্ষা করতে পারবো না যদি না আমরা মামুলি নীতি প্রথা পদ্ধতির প্রতি ভক্তি-প্রীতিকে উপেক্ষা করে আল্লাহ্র সত্যিকার শরীয়াকে মানুষের তৈরি সকল অনুসিদ্ধান্তমূলক ফিক্হী আইন থেকে আলাদা করবার সাহস সঞ্চয় করি। সংক্ষেপে, ইসলামী আইনকে এর আদি ক্ষেত্র ও পরিসরে আল-কুরআন ও সুন্নাহর সরল, স্বতঃপ্রমাণ এবং দ্ব্যর্থবোধকতামুক্ত নির্দেশসমূহে সীমিত করাতেই ইসলামের আদর্শকে সত্যিকারভাবে বোঝায়, তার সাংস্কৃতিক জড়ত্ব ও অবক্ষয় দূর করার, ধর্মীয় চিন্তায় বর্তমানে যে মারাত্মক চিন্তালেশশূন্য অনুকরণ বিদ্যমান রয়েছে তার অপনোদনের ও ইসলামী রাষ্ট্রে শরীয়াকে একটি জীবন্ত পদ্ধতি করে তোলার একমাত্র পথ রয়েছে।

www.pathagar.com

সার সংগ্রহ পদ্ধতি

ইসলামের শিক্ষানুযায়ী জীবনযাপন করতে এবং এর সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচীকে রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টায় রূপায়িত করতে স্থিরচিত্ত (দৃঢ় প্রত্যয়) যে কোন মুসলিম দলের প্রথম অপরিহার্য পদক্ষেপ হবে — আল-কুরআন ও সুন্নাহর সেই সব নসূসের সূত্রবদ্ধকরণ যেগুলোর মধ্যে জনসাধারণের ব্যাপার-বিষয়াদির সাথে সম্পর্কিত স্বতঃপ্রমাণ বিধান বা আইন রয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রের পরিপ্রেক্ষিতে এই পদ্ধতিটি আমার বিশ্বাস, কিছুটা নিম্নরূপ হবেঃ

১. মজলিস আশ-শূরা ফিকাহ্‌র বিভিন্ন মযহাবের প্রতিনিধিত্বমূলক পণ্ডিতদের দিয়ে একটি ছোট প্যানেল তৈরি করবেন। এঁরা আল্-কুরআনের পদ্ধতি-প্রণালী ও ইতিহাস এবং হাদীস-বিজ্ঞানের সাথে সুপরিচিত হবেন; সার সংগ্রহের বা সূত্রবদ্ধকরণের দায়িত্ব এঁদের উপরই অর্পিত হবে। এঁদের নিকট উল্লিখিত বিষয়ের আওতার মধ্যে এরা আল্-কুরআনের ও সুন্নাহর শুধু সেই সব বিধানের উপরই নিজেদের মনোযোগ কেন্দ্রভূত করবেন যেগুলো (ক) সম্পূর্ণভাবে 'নস'-এর ভাষাতাত্ত্বিক সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে অর্থাৎ শব্দ প্রয়োগের দিক দিয়ে যেসব নির্দেশ ও উক্তি স্বতঃপ্রমাণ (যাহির) যার শুধু একটি বিশেষ অর্থই আছে এবং একাধিক ব্যাখ্যার অবকাশ যাতে নেই, (খ) 'আদেশ' আরবী এবং 'নিষেধের' আরবী পরিভাষায় যা বলা হয়েছে; এবং (গ) মানুষের সামাজিক আচরণ ও কর্মের সঙ্গে যার প্রত্যক্ষ কর্মের সম্পর্ক রয়েছে।

২. আল্-কুরআন থেকে 'নস' নির্দেশসমূহ সংগ্রহ করা তুলনামূলকভাবে সহজ-কারণ, একটি মাত্র পাঠই শুধু আমাদের বিচার করতে হবে। তবে, হাদীসের ব্যাপারে এসব নীতির প্রয়োগ করতে হলে, প্রত্যেকটি বিষয়কে তার সঠিক ঐতিহাসিক পটভূমিকায় চুলচেরা বিচার করে দেখতে হবে উচ্চতম মানের ঐতিহাসিক এবং টেকনিক্যাল বিচারে যেসব হাদীস টিকবে শুধু সেগুলোই বিবেচ্য এবং যেসব হাদীসের সত্যতা সম্পর্কে বৈধ-আপত্তির সামান্যতম অবকাশ থাকবে, সেগুলোর শুরুতেই বাদ দিতে হবে। (এর মানে অবশ্যি এ নয় যে, যেসব হাদীস বিশুদ্ধ টেকনিক্যাল দৃষ্টিকোণ থেকে কিছুটা ত্রুটিপূর্ণ, অথচ অন্যান্য দিক দিয়ে সহীহ্ হাদীসের গুণসম্পন্ন সেগুলোকে সময়ে সময়ে ইজতিহাদের কাজে লাগানো যাবে না। এখানে যে বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিতে চাই তা শুধু এই যে, আলোচ্য 'শরয়ী' সার-সংকলনের উপকরণরূপে এসব হাদীস গৃহীত হতে পারে না)। যে সব হুকুম-আহকাম সকল কালে ও সর্বাবস্থায় বৈধ হবে বলে রসূল (সা) মনে করতেন, সেগুলোর সঙ্গে স্পষ্টত বিশেষ কোন অবস্থা বা কালের প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রদত্ত বিধানগুলোর

www.pathagar.com

পার্থক্য নির্ধারণের উদ্দেশ্যে বিশেষ যত্ন নিতে হবে। শেষোক্ত ধরনের বিধানগুলোর এই বৈশিষ্ট্য রসূলের শব্দপ্রয়োগের মধ্যেই অথবা উদ্দিষ্ট হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবা কর্তৃক হাদীসের সঙ্গে প্রদত্ত ব্যাখ্যামূলক মন্তব্যের মধ্যেই নিহিত। কখনো কখনো কোন একটি হাদীসের অন্তর্গত কোন নির্দেশের কালগত সীমাবদ্ধতা এই বিষয়ে অন্য হাদীসের দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিপরীত কোন আভাস-ইংগিত না পাওয়া গেলে, সহীহ্ হাদীস থেকে লব্ধ নস্ নির্দেশকে অবশ্যি সর্বকাল ও সর্ববস্থায় বৈধ বলে গণ্য করতে হবে।

৩. ইহা সুস্পষ্ট যে, শরয়ী কোর্ড স্থাপনের জন্য আল-কুরআনের বিচ্ছিন্ন আয়াত বা পৃথক পৃথক হাদীস বাছাই করার মধ্যে আমাদের চেষ্টা সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই আল্-কুরআন ও হাদীসের সমগ্র প্রসংগটি পূর্ণ বিবেচনা করতে হবে। কখনো কখনো দেখা যায়, আল্-কুরআনের কোন আয়াত নিজে হয়তো কোন আইনমূলক বিধানের নির্দেশক নয়। তাই অন্য একটি আয়াত বা সহীহ হাদীসের সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে নস্ আইনের গুণে গুণান্বিত হয়ে ওঠে। রসূলের সুন্নাহ সম্পর্কে ইহা আরো বেশি করে সত্য। আমাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, প্রচলিত হাদীসের প্রায় সবগুলোই তাঁর বাণীর বিচ্ছিন্ন কতগুলো টুকরো মাত্র, না হয় নেতা ও আইন-প্রণেতা রসূলের জীবৎকালের কতিপয় ঘটনার বিবরণ প্রায়ই ঐতিহাসিক পটভূমিকার সঙ্গে সম্পর্ক না রেখে বিবৃত। ফলে রসূলের কাছ থেকে প্রাপ্ত কোন আইনী নির্দেশ কোন কোন ক্ষেত্রে শুধু তখনি আইনী-নির্দেশরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, যখন আমরা কয়েকটি হাদীসকে পাশাপাশি রাখি অথবা সংশ্লিষ্ট হাদীসটি আমরা আল্-কুরআনের একটি সমজাতীয় আয়াতের সঙ্গে মিলিয়ে পড়ি। যে কোন অবস্থায় এ ব্যাপারটি কারো দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয় যে, আল্-কুরআন এবং সুন্নাহ এ দুটোতে মিলে একটি সুসংহত সমগ্র জিনিস — এরা পরস্পরের ব্যাখ্যা করে ও সম্প্রসারণ ঘটায়। সুতরাং প্রস্তাবিত শরয়ী সার-সংগ্রহে উভয়েরই পুরো আনুপূর্বিক প্রসঙ্গ নির্দেশক পাঠ-নির্দেশ করা দরকার।

৪. এইভাবে প্রতিষ্ঠিত আল-কুরআন ও সুন্নাহ্র 'নস' নির্দেশসমূহ একত্র সংগ্রথিত করতে হবে, মুসলিম সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন দিকের সঙ্গে সম্পর্কিত নির্দেশগুলোকে বিশেষ বিশেষ শিরোনামায় বিন্যস্ত করতে হবে এবং সারা মুসলিম জাহানের যোগ্যতাসম্পন্ন পণ্ডিতবর্গের কাছে সেগুলো পাঠাতে হবে — তাঁদের পরামর্শ ও সমালোচনার জন্য, বিশেষ করে যে সব নির্দেশের ভিত্তি হাদীস — সেগুলোর বিচার পদ্ধতি সম্পর্কে। আল-কুরআন ও সুন্নাহর যেসব 'নস' নির্দেশে আছে, আল-কুরআন ও সুন্নাহকে শুধুমাত্র সেগুলোতে সীমিত করা যে অভিপ্রায় নয়, এ সত্যটির উপর গুরুত্ব দেয়ার

www.pathagar.com

প্রয়োজন আছে; এটা সুস্পষ্টভাবে বলা দরকার যে, এই সার-সংগ্রহের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, সেই নির্দেশগুলোর উদ্ধার — যেগুলো তাদের ব্যক্ত (যাহির) বৈশিষ্ট্যের বদৌলতেই পরস্পর-বিরোধী ব্যাখ্যার সম্ভাবনা থেকে মুক্ত বলে ফিকাহ্‌র বিভিন্ন মযহাবের মধ্যে সম্ভাব্য বৃহত্তম সাধারণ ঐক্য-সূত্র হতে পারে। আল-কুরআন এবং সুন্নাহর যে সব উক্তির একাধিক ব্যাখ্যা সম্ভব সেগুলো যে এই সংগ্রহের আওতা থেকে পূর্বাহ্নেই (মোডিফিকেশন কমিটিকে প্রদত্ত আলোচনার মূল শর্তানুযায়ী) বাইরে রাখা হবে তাতে করে দল-উপদলও মযহাব নির্বিশেষে সকল মুসলমানের কাছে সংগ্রহটি যে শুধু গ্রহণযোগ্যই হবে তা নয়, এর ফলস্বরূপ এমন একটি রাষ্ট্রীয় আইন-সংগ্রহ মিলবে, যা হবে আকারে ক্ষুদ্র, অতিশয় সংক্ষিপ্ত এবং সে কারণে, গড়পড়তা সাধারণ বুদ্ধি ও শিক্ষার অধিকারী প্রত্যেক মুসলিম নর এবং নারীর পক্ষে হবে সহজবোধ্য।

৫. শরয়ী নির্দেশসমূহের প্রস্তাবিত ক্ষুদ্রতম সংগ্রহটি যেসব পণ্ডিতের নিকট পাঠানো হবে তাঁদের কাছ থেকে প্রাপ্ত সমালোচনা ও পরামর্শগুলোকে তাঁদের গুণের ভিত্তিতে বিচার করে দেখা হবে এবং সংগ্রহটি চূড়ান্ত সংশোধন ও সম্পাদনের বেলায় সেগুলোকে কাজে লাগাতে হবে এবং তার পর সংগ্রহটিকে দেশের বুনিয়াদী আইনরূপে গ্রহণ করার জন্য মজলিস-আশ-শূরায় পেশ করতে হবে।

নবদিগন্তের পথে

উপরে যেসব পরামর্শ দেয়া হয়েছে, সেসব পরামর্শ অনুযায়ী শরীয়ার সামাজিক হুকুম-আহকামগুলো সংগ্রথিত হলে ইসলামের (রাজনৈতিক কথাটির ব্যাপকতম অর্থে) সহসা এমন সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যেমনটি ইতিপূর্বে কখনো হয়নি। এর বিধিবদ্ধ আইনের প্রত্যেকটিই একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ গ্রহণ করবে, যার পরস্পরবিরোধী ব্যাখ্যার অবকাশ থাকবে না এবং প্রত্যেক মুসলমান জানবে যে, মুসলিম হিসেবে সে এ সব 'শরয়ী' আইনের তর্কাতীত কর্তৃত্ব মেনে নিতে বাধ্য। এর দ্বারা পাণ্ডিত্যপূর্ণ ইজতিহাদের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে না, বরং তা আরো বাড়বে। আমাদের অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, সত্যিকার শরীয়ার (আল-কুরআন ও সুন্নাহর 'নস্' হুমুক-আহ্‌কাম নিয়ে গঠিত) উদ্দেশ্য কখনো এ ছিল না যে, আমাদের জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটি এবং সম্ভাব্য প্রতিটি জটিল প্রশ্ন এর আওতায় পড়বে। বরং এটা শুধু একটা কাঠামো যার পরিসরে আমাদেরকে আমাদের সৃজনীশক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে এবং যার আলোকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে পরিচালিত করতে হবে। আমরা যদি ইহা স্মরণ রাখি, সঙ্গে সঙ্গেই আমরা বুঝতে পারব, যে এলাকায় আমাদেরকে অবশ্যি ইজতিহাদ বা

www.pathagar.com

মুক্ত বুদ্ধির প্রয়োগ করতে হবে তা কত বিশাল। স্বভাবতই, ইজতিহাদী চিন্তার বিভিন্ন সিদ্ধান্তের মধ্যে সর্বদাই পার্থক্য থাকবে। কিন্তু তাতে কী হয়েছে? শরীয়ার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিধানগুলো মুসলিম সমাজ জীবনের অপরিবর্তনীয় ভিত্তি হিসেবে একবার প্রতিষ্ঠিত হলেই 'অশরয়ী' বিষয়সমূহে আমাদের সকল মত-পার্থক্যের ক্ষেত্রে এই পুস্তকে অন্য উদ্ধৃত রসূল করীমের এই বিখ্যাত বাণীটি প্রযুক্ত হবেঃ

اختلاف علماء امتى رحمة-

'আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত পণ্ডিতদের মধ্যে মতপার্থক্য (মতানৈক্য) আল্লাহ্‌র রহমত (এর নিদর্শন)।'

বর্তমানে যা অবস্থা তাতে কোন সুস্থ-মস্তিষ্ক ব্যক্তিই দাবি করতে পারেন না যে, আধুনিক মুসলিম জগত যে দলাদলি ও মতানৈক্যের কারণে একটি আকারহীন, বিশৃঙ্খল, সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে বন্ধ্যা জনতায় পরিণত হয়েছে তার মধ্যে তিনি আল্লাহ্‌র রহমতের কোন প্রমাণ দেখতে পাচ্ছেন। ইসলামের সামাজিক ও রাজনৈতিক আইনের প্রকৃত তাৎপর্য কি, সে ব্যাপারে মৌলিক মতৈক্য না থাকাতে এই সব দলাদলি ও মতানৈক্য আমাদের সৃজনী-শক্তিকে মোটেই বাড়ায় না, উপরন্তু আমাদের সংশয়-সন্দেহ, আমাদের নৈরাশ্য, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আমাদের পরাজয়ী মনোভাবই বৃদ্ধি করে, আর বৃদ্ধি করে আমাদের নিজেদের প্রতি ও আমাদের আদর্শিক উত্তরাধিকারের প্রতি বিরাগ। এবং এরকমই চলতে থাকলে এর পরিণতিস্বরূপ একটা বাস্তব ব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম ক্রমশ পরিত্যক্ত হবে এবং এমনি করে আমাদের সংস্কৃতির চূড়ান্ত মৃত্যু হবে যদি না এবং যতক্ষণ না আমরা শরীয়ার সামাজিক ও রাজনৈতিক আইনগুলোকে সূত্রবদ্ধ করার দীর্ঘদিন অবহেলিত দায়িত্বের প্রতি এবং সেগুলোকে আমাদের সামাজিক জীবনের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা সম্বন্ধে আমরা সজাগ হই যতদিন না এটা করা হয়েছে, ততদিন ইসলাম কী সামাজিক পথে আমাদের প্রগতি প্রত্যাশ্যা করে সে সম্পর্কে মুসলমানরা বিপুল পার্থক্যসম্পন্ন এবং সে কারণে, অর্থহীন ভিন্ন মত পোষণ করতে বাধ্য — যে পর্যন্ত না, শেষে প্রগতি সম্পর্কে আমাদের সকল ধারণা ইসলাম থেকে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন হয়ে পড়ে।

আমরা মুসলমানরা কি চাই যে তা ঘটুক কিংবা আমরা কি — বাকী পৃথিবীর কাছে যেমন, আমাদের নিজেদের কাছে তার চেয়ে কম নয় — এটা সুস্পষ্ট করে তুলতে চাই যে, ইসলাম সকল কালের জন্য একটি বাস্তব ব্যবস্থা এবং সে কারণে আমাদের জন্যও?

www.pathagar.com

ইসলামী জীবনাদর্শকে আমরা মুসলমানরা যতটুকু ব্যবহারিক করে তোলার সিদ্ধান্ত করি ততটুকুই এটা ব্যবহারিক। অথবা আমরা একে যতটুকু অবাস্তব করে তোলার ইচ্ছা করি এটা ততটুকুই অবাস্তব। ইসলামী আইন সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে যদি আমরা আমাদের অতীতের ফিক্‌হী ধারণাগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখি তাহলে এটা অবাস্তবই থেকে যাবে। কিন্তু নতুন এবং সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে একে বোঝার এবং এর পরিসর থেকে সমস্ত মামুলি ফিক্‌হী অনুসিদ্ধান্তকে বাদ দেবার সাহস এবং কল্পনাশক্তি যদি আমাদের থাকে তা হলে এর ব্যবহারিকতা মুহূর্তের মধ্যেই দৃষ্টিগোচর হয়ে উঠবে। স্পষ্টতই, আমাদের অনেকের জন্যই, চিন্তাধারার এহেন সংস্কার সাধন বেদনাদায়ক হবে; কারণ চিন্তার এ সংস্কারের মানে হবে; মুসলমানরা তাদের ইতিহাসের ধারার যে সব চিন্তা–অভ্যাসের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন তার অনেকগুলোর সঙ্গেই তাদের মূলগত বিচ্ছেদ, শত শত বছরের ব্যবহারের দ্বারা 'পবিত্রীকৃত' সামাজিক রীতিনীতির অনেকগুলোর পরিবর্জন অথবা সংশোধন, ফিকাহ্‌র বিভিন্ন কিতাবে মুসলিম সমাজ–জীবনের সকল অলিগলির কথা প্রামাণ্য ও চূড়ান্তভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে এ আত্মতুষ্টিমূলক বিশ্বাস পরিহার এবং এসবেরই তাৎপর্য হবে যে দিগন্তের মানচিত্র এখনো তৈরি হয়নি তারই দিকে আমাদের অভিযাত্রা। এবং যেহেতু আমাদের মধ্যে যারা অধিকতর রক্ষণশীল তাদের জন্য এ ধরনের একটি সম্ভাবনা ভীতিপ্রদ, সেজন্য এই লক্ষ্যাভিমুখী যে কোন প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত জীবন্ত এক প্রতিরোধের প্রবর্তনা দেবে, বিশেষ করে সেই সব লোকের কাছ থেকে এই প্রতিরোধ আসবে যারা আমাদের অতীতকালের মহান ফকীহ্‌দের মতামতের উপর তর্কাতীত নির্ভরশীলতার বদৌলতে এক ধরনের কায়েমী স্বার্থ সৃষ্টি করেছেন এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক ব্যাপারসমূহে নিজেদের ভীরুতাকেই এক ধরনের পুণ্য মনে করে বসে আছেন। কিন্তু আমরা যদি ইসলামের — আর কিছু নয়, শুধু ইসলামের সাফল্য কামনা সম্বন্ধে জাগ্রত হই এ বাধাকে আমরা কিছুতেই আমাদের গতিরোধ করতে দিতে পারি না।

ইফাবা—৯৪-৯৫—প্র - ৩৫৭০ (উ)—৩২৫০

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ